ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
AGARTALA

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :

শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার),

কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণ : আগষ্ট ১৯৫৫

মূল্য : চার টাকা

মুদ্রাকর :

শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস. এম্. এ. (কম্.), বি. এল.

আই. এন. এ. প্রেস

১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রিয়বরেষু

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন	...	৩৫
পীঠমালা	...	৩৮
শিববিবাহের মন্ত্রণা	...	৪২
নারদের গান	...	৪৩
শিববিবাহের সম্বন্ধ	...	৪৩
শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম	...	৪৬
রতিবিলাপ	...	৪৯
রতির প্রতি দৈববাণী	...	৫১
শিব বিবাহ যাত্রা	...	৫২
শিববিবাহ	...	৫৫
কন্দল ও শিবনিন্দা	...	৫৮
শিবের মোহন বেশ	...	৬১
সিদ্ধিঘোটন	...	৬৩
সিদ্ধিভক্ষণ		৬৫
হরগৌরীর কথোপকথন	...	৬৭
হরগৌরী রূপ	...	৭০
কৈলাসবর্ণন	..	৭১
হরগৌরীর বিবাদসূচনা	...	৭৩
হরগৌরীকন্দল	...	৭৪
শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্‌যোগ	...	৭৭
জয়ার উপদেশ	...	৭৮
অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ	...	৮০
শিবের ভিক্ষাযাত্রা	...	৮২
শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ	...	৮৪
শিবে অন্নদান	...	৮৫
অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য	...	৮৭
শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা	...	৮৯
বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি	...	৯০
অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ	...	৯৩
দেবগণনিমন্ত্রণ	...	৯৬
শিবের পঞ্চতপ	...	১০০

বসুন্ধরের জন্ম	...	১৭৫
নলকূবরে শাপ	...	১৭৮
নলকূবরে প্রাণত্যাগ	...	১৮২
ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত	...	১৮৩
অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা	...	১৮৬

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলাদেশ বহিরাগত মুস্লিমশক্তির নিকট পরাভূত হয়। এই বহিরাগত তুর্কী মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার-প্রবণতা বাংলাদেশের উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত করাইয়া দিল। ইহারা বাঙ্গালীর বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র প্রধান বৌদ্ধবিহারগুলি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-অধ্যুষিত গ্রামগুলি একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ফলে সেন রাজাদের আমল হইতে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল তাহার স্রোত অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। তুর্কীদের ধ্বংসলীলার প্রায় দুইশত বৎসর পর পুনরায় বাংলাদেশে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হইল এবং এই সময়ই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত কোন মঙ্গলকাব্যের পুঁথি যদিও পাওয়া যাইতেছে না তথাপি বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের কাল বা যুগ বলিতে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকেই বুঝিতে হইবে। এই যুগে রচিত এক শ্রেণীর ধর্মকেন্দ্রিক আখ্যান-কাব্যই মঙ্গলকাব্য।

ত্রয়োদশ অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের কাল বলিলেও এবং এই কাব্যগুলির উদ্ভবের মূলে অত্যাচারী বৈদেশিক শক্তির প্রভাব কিছু পরিমাণ থাকিলেও আসলে এই কাব্যগুলির উৎস আরও অতীত যুগে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর্য-ব্রাহ্মণরা বরাবরই বাংলাদেশকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাই বলিয়া বাংলাদেশ অসভ্য বর্বরদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল না। এই অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীরা তাহাদের নিজস্ব এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক। বাংলাদেশে যাঁহারা প্রাক্-মুস্লিম যুগে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজারা দীর্ঘকাল বাংলাদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারাও কৃষিভিত্তিক বাঙ্গালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ ধার ধারিতেন না। পরন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরই তাঁহারা পরিপোষকতা করিয়াছিলেন। পাল রাজাদের পরবর্তী সেন রাজবংশ তো পূর্ণোদ্যমে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারে তৎপর ছিলেন। ফলে একই কালে বাংলাদেশে উপরে উপরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব চলিতে থাকিলেও কৃষিভিত্তিক সভ্যতাজাত বাঙ্গালীর লৌকিক সংস্কৃতি অন্তঃশীলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত ছিল।

পাল রাজাদের সময়েই যে বাঙ্গালীর লৌকিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের সামাজিক জগতে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া

ধর্ম-সংস্কার লৌকিক ধর্মমতের সৃষ্টি করিতেছিল, (২) অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্মমতের সঙ্গে ঐ সকল লৌকিক ধর্মমতকে মিশাইয়া নূতন নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি করিতেছিল, (৩) মুসলমান ধর্মমত ও অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অসহায় জনসাধারণ এক অলৌকিক দৈবশক্তির কল্পনা করিল এবং সেই শক্তিকে নানাভাবে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে ব্যস্ত হইল। এই সকল দেবতার মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের উদার ও কারুণিক-রূপ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না এবং এই দেবতারা নীচ, ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং ভয়ানক স্বার্থপর। ভক্ত যেমন নিত্য-প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে কাজে লাগায় তাঁহারও তেমনি ভক্তের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লন। একটু ত্রুটি ঘটিলেই সর্বনাশ। ভক্তকে তখন তাঁহারা ধনে-প্রাণে সংহার করেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা এই সকল ভীষণ প্রকৃতির দেবতার সাক্ষাৎ পাই। পরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এই ক্রূরমনা দেবতাবৃন্দ শান্ত ও করুণাময় হইয়া পড়িলেন। উগ্রা চণ্ডী শেষ পর্যন্ত অভয়দাত্রী ও অন্নদাত্রী অভয়া ও অন্নদায় পরিণত হইলেন।

যে হানাহানি ও বিরোধের পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্যের ক্রূরমনা ও প্রতি-হিংসাপরায়ণ দেবকুলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে পূজিতা দেবী তাঁহাদের সমগোত্রীয়া নহেন, যদিও এই দেবী পূর্ববর্তী যুগের মঙ্গল-কাব্যে আরাধ্যা শান্তোগ্র দেবীরই পরিবর্তিত রূপ। ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যদিও অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল তবুও ষোড়শ ও সপ্তদশ এই দুইটি শতাব্দীতে বাংলাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ অবস্থাই বিরাজমান ছিল। যে সামাজিক পটভূমিকায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর লৌকিক দেবকুলের আবির্ভাব ভারতচন্দ্রের সময়কার সামাজিক অবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ছিল। অবশ্য ভারত-চন্দ্রের অন্নদা বা অন্নপূর্ণা শান্তশ্রী-সমন্বিত স্নেহময়ী মাতৃমূর্তির প্রতীক হওয়ার অন্য কারণও বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুত্থান এবং বৈষ্ণব প্রভাব এই কারণের অন্যতম। তদুপরি, "তখনকার নানা বিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্তন-ব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে, সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক

ভারতচন্দ্রই এই কাব্যধারার প্রবর্তক। তাই তিনি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

ভারত ও পদআশে নূতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

এই অন্নদাই আবার দেবী কালিকা। অন্নদামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকা দেবীরই মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী হইতে অন্নদা বা কালিকার রূপান্তর পর্যন্ত ধারাটাকে আমরা এইভাবে বিভক্ত কবিতে পাবি—(১) চণ্ডীদেবী। ইনি উগ্র প্রকৃতির দেবতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইঁহার প্রথম আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইনিই পরবর্তী যুগে দেবী দুর্গারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। (২) চণ্ডীদেবীর সঙ্গে নানা পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীব মিশ্রণজাত মঙ্গলচণ্ডী দেবী—ইনি শান্তোগ্র দেবতা। (৩) ইনিই পরিণামে 'সন্তানকে দুধেভাতে' রাখিবার দেবতা বা অন্নদা বা অন্নপূর্ণা হইয়া একেবারে পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন।

দেবী অন্নদার সঙ্গে আবার বৈদিক অরণ্যানী দেবতার বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বেদে অদিতি, পৃথ্বী, সীতা, অরণ্যানী প্রভৃতি ভূমি ও শস্যদেবতাদের কথা পাওয়া যায়। এই দেবতাদের মধ্যে দেবীমাতা অদিতিই প্রধান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর উদ্ভব এই পুবাণে বর্ণিত হইয়াছে) দেবী বলিয়াছেন যে, তিনিই পৃথিবীকে ফলে, শস্যে পূর্ণ করিয়া তোলেন এইজন্যই তিনি শাকম্ভরী। শারদীয়া দুর্গাপূজাব একটি প্রধান অঙ্গ নবপত্রিকা পূজা। কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান প্রভৃতি দ্বারা এই পূজা করা হইয়া থাকে। এই পূজা ভূমিমাতার পূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই যে অন্নদা বা অন্নপূর্ণা যাবতীয় জীবের অন্নের সংস্থান করিয়া থাকেন তাঁহাকে ভূমি বা শস্যদেবতারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, দুর্গা বা অন্নদা বা অন্নপূর্ণা—ইঁহারা একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। তবে ইঁহাদের বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হইবার বিভিন্ন কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ বা নিদর্শন কাব্যে ও প্রস্তরশিল্পে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতেই দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ১১-১২শ শতাব্দীতে আসিয়া লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশসমন্বিত মহিষমর্দিনী দুর্গা-প্রতিমার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর ১৪শ হইতে ১৮ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলা কাব্যে মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনীর সঙ্গে উমা-

ঘটিয়াছে। কতক পারস্য, কতক বাঙ্গালা ও কতক সংস্কৃত "সাত নকলে আসল খাস্ত" তাহাই হইয়াছে। কোন কোন পদের চারি পাঁচটা কথাই নাই, সুতরাং অর্থ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে।—কি করি, উপায় নাই, আর একখানা হাতের লেখা পাইলে ঐক্য করিয়া দেখা যাইত।

এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে তিনি কোন্‌খানি প্রথম বিরচনা করেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না,—কিন্তু অনুমানে এরূপ স্থির হইতেছে যে, ত্রিপদীটিই সর্ব্বাগ্রে রচনা করিয়াছিলেন।—যেহেতু চৌপদীটি ইহার অপেক্ষা অল্পাংশেই উত্তম হইয়াছে। সময়াভাবশতঃ প্রথম বারের কথা অতি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন।—ফলে তিনি দুই জন নায়কের আদেশক্রমে দুইখানি পুঁথি দুই বার প্রস্তুত করত পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ চৌপদীচ্ছন্দের গ্রন্থখানির সর্ব্বশেষে ভণিতা স্থলে যেরূপ বর্ষের নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাতে সেইখানিকেই অনুজ বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।—যথা "সনে রুদ্র চৌগুণা" এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে ১১৩৪ সালে এই কবিতা রচিত হয়।—সুতরাং তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্রূপ তরঙ্গ বয়সে যে প্রকার চমৎকার কবিতাশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দি এবং বঙ্গভাষার যদ্রূপ সংস্কার দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হইবে।—জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতীত কোনক্রমেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য ভাষায় বিশেষরূপ কৃতবিদ্য হইয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার অগ্রজগণ দেখিলেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার ন্যায় সদ্বিদ্বান্ ও কীর্ত্তিকুশল হইতে পারেন নাই, অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "ভাই হে! সংপ্রতি পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন, জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ, অতএব এই সময়ে তুমি আমাদিগের এই বিষয়ের "মোক্তার" স্বরূপ হইয়া বর্দ্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয়, এবং

সাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিব সে পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই গৃহে গমন করিব না।

কয়েক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া তাজপুরের পার্শ্বস্থ সারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন, আচার্য্য বহু কালের পর "হারানিধি" জামাতাকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, মহাসমাদরপূর্ব্বক স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিলেন। অন্তঃপুরে আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল, প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনী সকলে আহ্লাদিতচিত্তে দেখিতে আইলেন।—ভারতচন্দ্র বিবাহ-বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরস্পর উভয়ের মনে যে প্রকার সন্তোষ, প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহা কি বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির করিতে পারিলাম না। কয়েক দিবস শ্বশুরসদনে অশেষবিধ আমোদ প্রমোদ করত আপনার স্ত্রীকে কহিলেন "যদি আমার বাবা কিংবা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোন মতেই সেখানে যেও না" এবং শ্বশুরকে কহিলেন "মহাশয়! আপনার কন্যাকে আমাদিগের বাটীতে কখনই পাঠাইয়া দিবেন না, যদবধি আমি অর্থ আনিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিতে না পারি, তদবধি এইখানেই রাখিবেন।" এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ও মান্যবর শ্রোত্রিয় পালধিবংশ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (যাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট অদ্যাবধি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে শোভা করিতেছে) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অতিশয় কাতরতা সহকারে নিবেদন করিলেন "মহাশয়! আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, শরণাগত হইলাম, যে প্রকারে হউক, সদয় হইয়া আশ্রয় দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবেক।" দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াও পুরাতন ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল জানিতে পারিয়া এবং স্তবে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আশ্বাসবাক্যে সাহস প্রদানপুরঃসর কহিলেন "তুমি অতি যোগ্য ও প্রধান বংশের মনুষ্য, তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল, তুমি এখানে থাকিয়া কিছু দিন অপেক্ষা কর, আমি বিহিত চেষ্টায় রহিলাম, সুযোগ-যুক্ত সময় পাইলে ও কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তোমার মঙ্গল সাধনে সাধ্যের ত্রুটি করিব না।" এতদ্রূপ

রামদেব নাগ পত্তনিদার হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি ও আব আর লোকের উপর দৌরাত্ম্য কবাতে রায় কবিবর ক্রোধাধীন হইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বপ্রকাশপূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে সংস্কৃত কবিতায় "নাগাষ্টক" রচনা কয়ত পত্রযোগে কৃষ্ণনগরে প্রেবণ করেন, মহাবাজ সেই পত্র এবং "নাগাষ্টক" পাঠ কবিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভাবতেব বচনা-কৌশলের প্রতি অনুরাগপূর্ব্বক অনেক গুণ ব্যাখ্যা কবলেন, আর অনুবোধ দ্বাবা নাগেব দৌবাত্ম্য নিবাবণ করিয়া দিলেন। ....

কাব্যকর্ত্তা কবিকেশবী ভাবতচন্দ্র এইরূপ আমোদ আহ্লাদ, হাস্য কৌতুকে কয়েক বৎসব কাল হবণ কবত ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র-বোগে মানবলীলা সম্ববণপূর্ব্বক যোগ্য ধামে যাত্রা কবিলেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ এককালেই নির্ব্বাণ হইল।—সকলে হাহাকাব কবিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ কহেন, তাঁহাব প্রথম বোগের সূত্র বহুমূত্র, কিন্তু তৎপবে ভস্মক বোগ জন্মিয়াছিল।

ইনি ১৬৩৩ শকে, বাঙ্গালা ১১১৯ সালে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বাঙ্গালা ১১৬৭ সালে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। বর্ত্তমান ১২৬২ সাল পর্য্যন্ত তাঁহাব বৎসব গণনা কবিলে ১৪৩ বৎসব, এবং মৃত্যু বৎসব গণনা করিলে ৯৫ বৎসব হইবেক। আহা! কি পবিতাপ! এমত গুণশালী মহাত্মা মহোদয় ৪৮ বৎসবেব অধিক কাল এই বিশ্বধামে বিবাজ কবিতে পাবেন নাই। এই ৪৮ বৎসবেব মধ্যে বিংশতি বৎসর বাল্যলীলা এবং বিদ্যাভ্যাসে গত হয়, তাহাব পব দুই তিন বৎসর বর্দ্ধমানে বিষয়কর্ম্ম ও কাবাভোগ কবিয়া অনুমান ১৫।১৬ বৎসব উদাসীনেব বেশে নীলাচলে দেবদর্শন ও শাস্ত্রালোচনায় গত হইল,—তৎপবে এক বৎসব কাল শালীপতি ভ্রাতাব বাটীতে ও শ্বশুবালয়ে এবং ফবাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনাবায়ণ চৌধুবীব নিকটে ক্ষয় কবত ৪০ বৎসব বয়সেব সময়ে নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হইলেন, এবং সেই বর্ষেই "অন্নদামঙ্গল" এবং "বিদ্যাসুন্দর" রচনা কবিলেন। উক্ত সংযুক্ত গ্রন্থের বয়স ১০৩ বৎসর হইল, কাবণ তিনি ১৬৭৪ শকে, বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে বচনা করেন, অন্নদামঙ্গলে তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে, ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত, ভারত রচিলা॥"

ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং অন্নদামঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দের পরিচয়

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যকে একচ্ছত্র শাসনাধীনে রাখিবার মত দক্ষ শাসনকর্তার একান্ত অভাব ঘটিল। কিছুদিনের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। অতঃপর প্রাদেশিক শাসন-কর্তারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সমগ্র দেশে ঘোর অরাজকতা দেখা দিল, প্রত্যেকেই নিজের কোলে ঝোল টানিবার মনোভাব-দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিলেন। এই অরাজকতা এবং তজ্জনিত হানাহানির ঘটনা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাতেই সর্বাধিক ঘটিতে লাগিল।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। তখন বাংলাদেশের নবাব ছিলেন আলীবর্দী খাঁ। মুর্শিদাবাদের অদূরে নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত জমিদার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়াই ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনা করেন। আলীবর্দী খাঁ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন এবং তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। সিরাজদ্দৌলা মাত্র এক বৎসর দুই মাস নবাবী করিতে সক্ষম হন। ভারতচন্দ্র বাংলাদেশের এক চরম যুগসন্ধিক্ষণের ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যে ঐসব ঘটনার প্রায় কোন ছায়াপাতই ঘটে নাই। তিনি ইতস্ততঃ কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামোল্লেখ করা ছাড়া ইতিহাসকে মোটামুটি তাঁহার কাব্য হইতে নির্বাসন দিয়াছেন। তৎ-কর্তৃক উল্লিখিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের পরিচয় এই প্রসঙ্গে দেওয়া যাইতেছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ—ঔরঙ্গজীব ১৭০৫ সালে ইঁহাকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ঢাকা হইতে বাংলাদেশের রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার নামানুসারেই উক্ত নগরীর নামকরণ হয়। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুজাউদ্দিন—মুর্শিদকুলি খাঁয়ের জামাতা। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের মৃত্যুর পর ইনি বাংলাদেশের শাসক হইয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

অন্নদামঙ্গল

(সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—(১) অন্নদামঙ্গল (২) বিদ্যা-সুন্দর (৩) ভবানন্দ মজুমদারের পালা। তিনখণ্ডে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন যোগসূত্র নাই। বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই সুবৃহৎ কাব্যের প্রথম খণ্ড অন্নদামঙ্গল।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে মোট ছিয়ানব্বইটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি সমগ্র কাব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। অর্থাৎ এই গুলিকে একক হিসাবে না দেখিয়া সমগ্র কাব্যেব অন্তর্গত অংশ হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে যদিও একক হিসাবে ইহাদের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা। অন্নদামঙ্গল বচিত হওয়ার কারণ বর্ণনা কবিতে গিয়া গুপ্তকবি তাঁহাব ভারতচন্দ্রেব জীবনবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "ভাবতচন্দ্র প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে বাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকব' উপাধি প্রদান কবত আজ্ঞা করিলেন, 'ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমাব মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা কবি না।' ভাবতচন্দ্র কহিলেন, 'মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।' র া কহিলেন, 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা-কবিতায় 'চণ্ডী' বচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতি ক্রমে 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক প্রস্তুত কর।' সেই আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।"

কাব্যের সূচনায় প্রথম আটটি কবিতাতে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতি অনুসারে ভারতচন্দ্রও বিভিন্ন দেবদেবীর—গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। অতঃপর গ্রন্থসূচনা। মঙ্গলকাব্যের কবিরা যেমন গ্রন্থ লিখিবার একটি অলৌকিক কারণ দর্শাইয়া থাকেন ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। কাব্য-রচনার কারণ-স্বরূপ ভারতচন্দ্র বলিতেছেন যে, বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের

তখন,

প্রস্থতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজ্যসহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা ॥

কিন্তু তাহাতে এক করুণ অথচ কৌতুকাবহ ব্যাপারের সৃষ্টি হইল,

ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুবে কবন্ধের প্রায় ॥
দক্ষেব দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রস্থতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন ॥

শিবেব নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া সতী দক্ষকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, দক্ষের ছাগমুণ্ড হইবে। নন্দী তখন একটা ছাগল কাটিয়া আনিয়া দক্ষের ঘাড়ে বসাইয়া দিল। দক্ষ তখন সেই ছাগ-মুণ্ড দিয়া শিবেব বিস্তর স্তুতি করিলেন।

এদিকে শিবের মনে কোন শান্তি নাই। তিনি সতীব মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া সতীর গুণবাশি গাহিয়া গাহিয়া নানাস্থানে উন্মাদের মত ঘুবিতে থাকেন। সতীর মৃতদেহ তাঁহাব স্কন্ধেব উপব বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। শিবেব কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন,

তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধাবে করি খানি খানি ॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেইস্থান পূজিত বিধিব ॥

বিষ্ণুর চক্রদ্বারা সতীদেহ এইভাবে খণ্ডিত হইয়া একান্নটি স্থানে পতিত হইয়াছিল। সেই একান্নটি স্থান অবিলম্বে পুণ্য তীর্থপীঠে পরিণত হইল। 'পীঠমালা' কবিতায় ভারতচন্দ্র সেই একান্ন পীঠের কথা বলিয়াছেন। অতঃপর,

শূন্য শিব দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান।
হিমালয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান ॥

সতীদেবীর বিলয় হইতে পারে না। তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে উমার যৌবন-সমাগম ঘটিলে দেবগণ শিবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়ার সঙ্কল্প করেন, শিব কিন্তু তখন কৈলাস-শিখরে গভীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। দেবতারা কিছুতেই তাঁহার ধ্যানমগ্ন অবস্থার ব্যত্যয় ঘটাইতে পারিলেন না। কালিদাসের কুমার-

সম্ভব কাব্যে "নিবাত নিষ্কম্প" মহাদেবের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে ভারতচন্দ্রের উপর তাহার প্রভাব এই স্থলে স্পষ্টতই লক্ষণীয়। শিবের নিকট হইতে কোন প্রকার সাড়া না পাইয়া দেবগণ,

মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বান করিয়া সন্ধান
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥

মদনের সম্মোহন বাণে শিবের ধ্যানভঙ্গ হয় বটে কিন্তু ইহাতে তিনি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ফলে তাঁহার তৃতীয় লোচন অগ্নিসম তেজে জ্বলিয়া উঠে, মদন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু মদনের বাণে শিবের সারা দেহে ও মনে প্রচণ্ড কামোত্তেজনা দেখা দেয়। তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া আশেপাশে যে সব অপ্সরা-কিন্নরী ছিল তাহাদের পশ্চাতে ছুটিতে থাকেন। একটু পূর্বেই ধ্যানমগ্ন শিবের যে মৌন-গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া আমরা সম্ভ্রমে মাথা নত করি তাঁহার এই কামোন্মত্ত বিচলিত ভাব দেখিয়া স্বভাবতই আমাদের মনে কৌতুকের সৃষ্টি হয়। কবিবর ভারতচন্দ্র যোগীশ্রেষ্ঠ শিবের নিদারুণ দুর্গতি ঘটাইয়াছেন,

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

তখন দক্ষ আসিয়া সহাস্যে শিবকে নিবেদন করিল যে, সতী গিরিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে বিবাহ করিয়া শিব আনন্দে বিহার করুন। উতলা শিব কহিলেন, 'ওরে বাছাধন' শীঘ্র তার ব্যবস্থা কর। দেবগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, শিব-বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে থাকিল।

একদিকে মদনের মৃত্যুতে রতির বিলাপের অন্ত নাই। সে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল,

শিব শিব শিব নাম সবে বলে শিবধাম
বাম দেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে॥
শিবের কপালে বয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে বহে আরের কপাল দহে
আগুনেব কপালে আগুন।

নিদারুণ শোক সহ্য করিতে না পাবিয়া একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া রতি তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিল। তখন আকাশে দৈববাণী হইল। সেই দৈববাণীতে মদনেব পুনরুজ্জীবনের নির্দেশ ব্যক্ত হইল। রতি শান্ত হইয়া আত্মহত্যাব সঙ্কল্প ত্যাগ কবিল।

উমার সঙ্গে শিবের পবিণয়েব দিন নির্দিষ্ট হইল। মহাদেব সঙ্গী-সাথী লইয়া হিমালয়গৃহে যাত্রা করিলেন। ববযাত্রীদেব মধ্যে দেবতা ও ভূত-প্রেত সকলই আছে। কিন্তু ভূত-প্রেতেব প্রমত্ত উল্লাসের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত দেবতারা সরিয়া পড়িলেন। মহাদেবেব চেলা-চামুণ্ডা এই ভূত-প্রেতসমূহের উল্লাস বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—

ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্প ঝম্প দিয়া দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো।
থাবায় থাবায় মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভালো॥
করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিঁহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি
লক লক লক জিহি।

শিব তখন মেনকার দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই দিব্যকান্তি মোহন বেশ দেখিয়া মেনকার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বিবাহ-বাসরে সমবেত নরনারীবৃন্দ সবিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং শিব,

উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস॥

কৈলাসে আসিয়া শিব নন্দীকে সিদ্ধি ঘুঁটিতে আদেশ দিলেন। সে এক বিরাট কাণ্ড। নন্দী নানাবিধ দ্রব্য সহযোগে বার লক্ষ মণ সিদ্ধি ঘুঁটিল। সেই সিদ্ধি ভক্ষণ করিয়া শিব মধুর নেশায় ঢুলিতে লাগিলেন। অতঃপর নববিবাহিতা দম্পতীর কথোপকথন সুরু হইল। পার্বতীই যে বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ, তিনিই যে মূল প্রকৃতি শঙ্কর তাহা অবগত আছেন। তাই তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা করিলেন,

অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥

দেবী শঙ্করের স্বভাব ভাল করিয়াই অবগত আছেন। তিনি সহাস্যে শঙ্করকে খোঁচা দিয়া কহিলেন,

হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥
অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

শিব ভীষণ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন বলিলেন যে, এমন আচরণ তিনি কখনই করিতে পারেন না। সতীর দেহত্যাগের পর তিনি কিভাবে সতী-অঙ্গ স্কন্ধে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন শিব সেই বিবরণ দিলেন। গৌরী খুসী হইলেন এবং অতঃপর সানুরাগে হর-গৌরী মিলন সাধিত হইল।

উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥

এইরূপে হর-পার্বতীর কলহ চরমে পৌঁছিল। এই কলহে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজজীবনের ছায়াপাত অতি সুস্পষ্ট। নিষ্কর্মা উদাসীন প্রকৃতির স্বামী আর অভাবে জর্জরিতা স্ত্রী। তদুপরি বাউণ্ডুলে প্রকৃতির কতকগুলি ছেলেপিলে। একবেলা আহার জুটে তো আরেক বেলা জুটে না। বাঙ্গালীর সংসারের এই চিত্র আজকের দিনেও বিরল নয়।

লজ্জা ও ক্ষোভে শিব মরিয়া গেলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার নিদারুণ বীতশ্রদ্ধা আসিয়া গেল। তিনি ভিক্ষায় বাহির হইলেন,

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহার উচিত বনবাস॥

কিন্তু কিই বা শিব করিতে পারেন। তাঁহার তো ভিক্ষা করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই,

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিলা বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥

পার্বতীও 'যে ঘরে গৃহস্থ হেন' সেই ঘরে আর থাকিবেন না বলিয়া মনস্থ করিলেন। তিনি কার্তিক ও গণেশকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় সখী জয়া অভয়াকে উপদেশ দিলেন যে, এমন করিয়া পিতৃগৃহে যাওয়া ঠিক হইবে না, কারণ বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে আদর পায় না। বাপ-মা কয়েক দিন

আদর করেন বটে কিন্তু তারপরেই বিরসবদন হইয়া যান। ভাজ (ভ্রাতৃবধূ) সর্বদাই কটু কথা কহে,

জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥

কাজেই জয়ার উপদেশ এই যে, দেবী **অন্নপূর্ণারূপে** প্রকাশিত হোন। তাঁহাকে তখন,

তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে
চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে।
দ্বিতীয়া অন্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত
বিসর্জ্জন নবমীতে॥

দেবী অন্নপূর্ণা মূর্তি ধারণ করিলেন এবং শিবকে জব্দ করিবার জন্য বিশ্বের সকল অন্ন হরণ করিয়া লইয়া আসিলেন।

এদিকে,

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥

কোথায়ও অন্ন না পাইয়া শিব শেষ পর্যন্ত,

ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী নারায়ণ॥
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁপর॥

লক্ষ্মী শিবকে অন্নপূর্ণার কাছে যাইতে উপদেশ দিলেন। ঘরে যাঁর জগৎপালিনী অন্নপূর্ণা পত্নীরূপে অধিষ্ঠিতা তিনি কেন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। শিব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অন্নপূর্ণা শিবকে ষোড়শোপচারে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। আশুতোষের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হইল। তিনি অন্নদার গুণগানে রত হইলেন। কবি বলিতেছেন অন্নপূর্ণা স্বয়ং প্রকৃতিস্বরূপা। তিনি আদ্যাশক্তি,

পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে॥
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈলা ভবানন্দ মজুন্দার॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখে বাড়ে কহিতে অপার॥

এইখানেই অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ দেবীর ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে আগমনের অধ্যায় পর্যন্ত কাব্য সমাপ্ত।

[অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর "যশোর নগর ধাম, প্রতাপআদিত্য নাম," সেই প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে বাংলাদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ বর্ধমানে আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন। ভবানন্দ বর্ধমানে মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মানসিংহ ভবানন্দের নিকট বর্ধমানের রাজার রূপবতী কন্যা বিদ্যার সঙ্গে বিদেশী রাজপুত্র সুন্দরের যে প্রণয়লীলা হইয়াছিল তাহার বিবরণ শ্রবণ করেন। এই বিবরণই অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড ভবানন্দ মজুমদারের পূর্ণ কাহিনী। রাজা মানসিংহ বর্ধমান হইতে যশোরে আসিয়া প্রতাপাদিত্যকে নিহত করেন। এই সময় ভবানন্দ মানসিংহকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। মানসিংহ ভবানন্দকে দিল্লীতে বাদশাহের নিকট লইয়া যান, বাদশাহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া ভবানন্দকে নানাবিধ পুরস্কার দান করেন। ভবানন্দ বাদশাহের নিকট হইতে ফরমান লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং নবদ্বীপে দীর্ঘকাল সুখে রাজত্ব করেন। এই ভবানন্দের বংশেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। এইখানেই অন্নদামঙ্গল কাব্যের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে।]

॥ কবি ভারতচন্দ্র ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ॥

আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতিতে কোন কবির কাব্য-বিচার-প্রসঙ্গে তাঁহার কবিমানসের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। আবার সেই সঙ্গে যে বিশেষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ কবির মানস-পরিমণ্ডল গঠনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কার্যকরী হইয়াছে তাহারও পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতে হয়। মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিকুলের মানস-পরিমণ্ডলের পরিচয় জানিতে গিয়া কিন্তু এক বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিদের মনোভূমিটি যেন প্রায় একই ছাঁচে গঠিত। ধর্মীয় মনোবৃত্তির প্রেক্ষাপটে এক প্রচণ্ড দৈব শক্তির লৌহনিগড়ে যেন তাঁহাদের মন-প্রাণ আবদ্ধ। ঐ যুগের বৈষ্ণব কবিরা ইহার সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের কবিপ্রাণও এক অনৈসর্গিক প্রেমবন্যার প্রবল স্রোতে সর্বদা দ্রবীভূত। তাঁহারাও প্রথাবদ্ধ সংস্কারের এবং অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত কাব্য-নির্মিতির আমোঘ বিধানের নিকট সর্বদা নতশির।

মঙ্গলকাব্যে এই প্রচলিত সংস্কারের প্রতি আনুগত্য আরও প্রবল। দেশময় অরাজকতা, জীবন-ধারণের অপরিসীম বিড়ম্বনা ও গ্লানি, সর্বত্র এক সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা। এই কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ও সাহস তখনকার দিনে কাহারও ছিল না। দুঃসহ অনিশ্চয়তার বদ্ধমুষ্টি ছিন্ন করিতে হইলে যে বীর্যবত্তা, পুরুষকার তথা মনুষ্যত্বের প্রয়োজন দীর্ঘকাল বাংলাদেশে তাহার অসদ্ভাব ছিল। কাজেই সাংসারিক দুঃখদুর্দশা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মানুষ অতিমাত্রায় দৈবশক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া পড়িয়াছিল। একান্ত দৈবনির্ভরতা তখনকার দিনের সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল। কবিরা সমাজ-বহির্ভূত জীব নহেন, কাজেই তাঁহাদের কাব্যেও এই কথাই বারবার প্রচারিত হইয়াছে যে, পুরুষকারের কোন মূল্য নাই, দৈবের বিরুদ্ধে মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। মনসা-মঙ্গলের চন্দ্রধরকে অনেকে পৌরুষের মূর্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। চাঁদ সদাগর শঙ্কর ও ভবানীর উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি এই বিত্তবান বণিকের ভক্তি ও আনুগত্য এত প্রবল ছিল যে, তিনি অন্য কোন দেবদেবীকেই সহ

আবার নিতান্ত ক্রূর-প্রকৃতির। নানাভাবে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। সন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা ভক্তের জন্য সব কিছু করিয়া দিতে পারেন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি এইরূপ পুরুষ ও স্ত্রী-দেবতার বন্দনায় মুখরিত। আবার বন্দনার রীতিটিও সর্বত্র একই প্রকার। এমন কি কাব্য-রচনার কারণটিরও (স্বপ্নাদেশ) ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই।

এই গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের ধারার সার্থক ব্যতিক্রম হইতেছেন মঙ্গলকাব্যের স্বর্ণযুগের কবি মুকুন্দরাম এবং অস্তায়মান যুগের কবি ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরামের কাব্যের কাহিনীর কোন অভিনবত্ব নাই। প্রচলিত কাব্যাঙ্গকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহাব কাব্যে এক আশ্চর্য জীবনানুভূতি তথা সমাজ-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের কাব্যের তথা সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব যখন প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে তখন ভারতচন্দ্র শেষবারের মত তাঁহার বিদগ্ধ প্রতিভার আলোকে এই কাব্যশিখাটিকে নির্বাপণেব পূর্বে অত্যুজ্জ্বাসিত করিয়া তুলিলেন।

মঙ্গলকাব্যের এই দুইজন কবির মানস-পরিমণ্ডল তৎকালীন সমাজ-জীবনের প্রেক্ষাপটে আমরা অনুধাবন করিতে পারি। অন্যেরা হাটের ভীড়ে হারাইয়া যান। মনসামঙ্গলের কাব্য-কাহিনী নিরতিশয় করুণ। করুণরসে বাঙ্গালীর আসক্তি চিরকালেই প্রবল। তাই এই কাব্য খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মনসামঙ্গলে সমাজ-জীবন, বাঙ্গালীর বাণিজ্য-যাত্রা প্রভৃতির উপাদান ইতস্তত: ছড়াইয়া রহিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ঐগুলি নিতান্তই গতানুগতিক ও প্রথাবদ্ধ। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে যেমন খুন-জখম, রাহাজানি, নারী-ধর্ষণ দেওয়াই চাই ঠিক তেমনি মঙ্গলকাব্যগুলিতে রান্নার লম্বা ফর্দ, বারমাসিয়া দুঃখের বিবরণ, বণিকের সওদার বিস্তৃত তালিকা থাকিবেই। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, চাঁদবেণের বদল-বাণিজ্যের যে ফর্দ মনসা-মঙ্গলের কবিরা তৈয়ারী করিয়াছেন, চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের সিংহল-যাত্রাকালীন ফর্দটির সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দিল্লী হইতে বহুদূরে অবস্থিত বাংলাদেশে মোগল-পাঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখানকার সমাজ-জীবন তথা ব্যক্তিজীবনে যে নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছিল একমাত্র মুকুন্দরাম ব্যতীত আর কোন কবিরই সেই সম্পর্কে কোন প্রকার চেতনা ছিল বলিয়াই মনে হয় না। অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশে পতনোন্মুখ মোগলশক্তি, মারাঠাদস্যুদের প্রবল উৎপীড়ন, সর্বোপরি সাত সমুদ্র তের নদীর

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে নিপীড়ন আসিল তাহা হইতে কে রক্ষা করিবে এই প্রশ্নটি মানুষের মনে তখন প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। অনন্যোপায় ভীরু-প্রাণ অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই জগজ্জননীর চরণে আশ্রয় খুঁজিল। জগজ্জননী মাতার নিকট করুণ আবেদন জানাইয়া ভক্ত সন্তান নিজেকে রক্ষা করিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিল। ভক্ত-হৃদয়ের এই আর্তিপ্রকাশের জন্য কোন বৃহদাকৃতি কাহিনীর প্রয়োজন হইল না। গীতিকবিতাব সুরে ভক্তের নিবেদন ও দেবমহিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভক্তকবি রামপ্রসাদ এই গীতিকবিতাগুলির প্রবর্তক।

রামপ্রসাদ ভক্ত ছিলেন, ভারতচন্দ্র ভক্তির বিশেষ কোন ধার ধারিতেন না। বিশেষ এক উদ্দেশ্যে তিনি দেব-বন্দনাকে তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়াছিলেন। উভয়ের মনোভঙ্গী যেখানে এত বিপরীত সেখানে তাঁহাদের কাব্যের বিষয়বস্তুর সমালোচনা অবান্তর। তাই শুধু কাব্য-প্রতিভা এবং সমাজ-চেতনার দিক দিয়াই কবি-দ্বয়ের সমালোচনা সম্ভব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সর্ববিক্ত সমাজ ও হৃতসর্বস্ব মানুষের বেদনার কথা রামপ্রসাদের কবিচিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। কোন্ পাপে, কি অপরাধে মানুষের ভাগ্যে এই নিদারুণ বঞ্চনা তাহা ভাবিতে গিয়া রামপ্রসাদ বিমূঢ় হইয়াছেন। তাই সন্তান যেমন জননীর কাছে অভিমান করে তেমনি তিনি জগজ্জননীর কাছে অভিমান করিয়া বলিয়াছেন,

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন অবিচারে আমার 'পরে, কবলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?

যদিও এই অভিমানের আড়ালে অধ্যাত্ম-চেতনা সুস্পষ্ট তবু সমাজ-জীবনের চিত্রের মাধ্যমেই তিনি মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

সমাজদেহের নিদারুণ বৈষম্য তাঁহাকে এত পীড়িত করে যে, তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,

জানি গো জানি তারা, তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা॥
কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায় দেয় শাল দোশালা কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥

রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলিতে সমাজ-জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভক্ত কবি তাঁহার সঙ্গীতের সর্বত্র আকারে-ইঙ্গিতে, তুলনায়-রূপকল্পে, সমাজ-

নামিয়া আসিয়াছে। তাঁহার কাছে তাই সমাজের এই সমস্ত মানুষ, যাহারা দুর্দৈব ও অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারা কৌতুকের পাত্র। মুকুন্দরামের কাব্যে এই কৌতুকপ্রিয়তাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতচন্দ্রের কৌতুকপ্রিয়তা আদিরসের পোষকতা করিয়াছে কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্য 'নির্মল, শুভ্র ও সংযত' হাস্তরসের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মুকুন্দরামের কাব্যে বাস্তবরসানুভূতি ও জীবনানুভূতি অতিশয় উজ্জ্বল কিন্তু ভারতচন্দ্রে তাহা প্রায় অনুপস্থিত। মুকুন্দরামের বন্দিতা দেবী আর্ত ও নিপীড়িত মানবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ভারতচন্দ্রের দেবী বিলাসীর বিলাসোপকরণের একটি অঙ্গ মাত্র। হরগৌরীর সংসারের যে চিত্র উভয় কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়াই উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম-বর্ণিত এই চিত্রে বাঙ্গালীর দরিদ্রঘরের গার্হস্থ্য-জীবনের কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্র নিতান্তই গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। মধ্যযুগের এই দুই বিশিষ্ট কবির কাব্য পাঠ করিলে এই কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ভিন্ন রুচি, ভিন্ন সংস্কার ও সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই যুগের প্রেক্ষাপটে এই কাব্য দুইখানি রচিত। একজন মঙ্গলকাব্যের স্বর্ণযুগের কবি, অপরজন অস্তায়মান যুগের কবি। মুকুন্দরামের কাব্য স্বভাবগুণে মধুর আর ভারতচন্দ্রের কাব্য 'সরস' ভঙ্গীর জন্য মধুর।

দুইশত বৎসরের পরবর্তী হইয়াও ভারতচন্দ্র কিন্তু মুকুন্দরামের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। হর-গৌরীর সংসারের চিত্র-বর্ণনায় এই প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। এই প্রভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়গত। কবিত্বের দিক দিয়া ভারতচন্দ্র নিঃসন্দেহে অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। যেমন মুকুন্দরামের কাব্যে ছদ্মবেশধারিণী চণ্ডী আত্ম-পরিচয়-প্রসঙ্গে কালকেতুকে বলিতেছেন,

কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।

আর অন্নদামঙ্গলে দেবী ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে ঐ প্রসঙ্গেই বলিতেছেন,

গঙ্গা নামে মোর সতা তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সেই স্বামী শিরোমণি॥

ভারতচন্দ্রের শিল্প-প্রতিভা : ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে পুরাতন বস্তুকে নূতন আধারে পরিবেশন করিয়াছেন। পুরাতন আধার যে অচল হইয়া

অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। দেবী অন্নদা শিবকে অন্নদান করিতেছেন, ভোজনের আনন্দে শিব মাতিয়া উঠিয়াছেন,

পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চুষিয়া॥
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া।
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥

একাবলী ছন্দে রচিত এই বর্ণনাটির অন্য গুণ না থাকিলেও ভাবানুযায়ী সার্থক হইয়াছে বলিতেই হইবে।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহাদের উপাদেয় এবং স্বাদু বর্ণনাভঙ্গী দেখিয়া উহাদিগকে গীতিকবিতা বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করে। এই কবিতাগুলিতে কবির আত্মগত তন্ময় ভাব স্বভাবতঃই পাঠকের মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি করে। দুয়েকটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইতে পারে। 'কৈলাস বর্ণন' কবিতায়,

কৈলাস ভূধব অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস॥
... ...
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফুলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে॥

ঘটিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের কাঠামোটি মাত্র গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাহাতে নূতন ভাব ও ভঙ্গীর অনুপ্রবেশ ঘটাইলেন এবং এই ভাবেই তাঁহার কাব্য মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যধারার অবসান সূচিত করিল।

অন্যদিকে ভারতচন্দ্র-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ, ইহার রুচি ও প্রকৃতি পরবর্তী একশত বৎসরের বাংলা কাব্য-কবিতাকে প্রভাবিত করিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধ হইতে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত একশত বৎসর ধরিয়া বাংলা কাব্য-কবিতা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে আদর্শ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। কবিগান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি লোকরঞ্জক মাধ্যমগুলি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজ-বণিককুলের সঙ্গে সম্পদাহরণে যে সকল বাঙ্গালী সন্তান যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অপরিমিত অর্থের প্রাচুর্য যেভাবে কলিকাতা নগরীতে বিলাসের পঙ্কিলস্রোত প্রবাহিত করাইয়াছিল তাহাতে নীতি বা রুচির কোন বালাই ছিল না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এই রুচির সঙ্গে সুন্দর খাপ খাইয়া গিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার উদ্বোধন করিলেন তাহার প্রাকাল পর্যন্ত আমাদের অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যের উপর ভারতচন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম। এমন কি মহাকবি মধুসূদন পর্যন্ত তাঁহার একটি সনেটের (অন্নপূর্ণার ঝাঁপি) বিষয়বস্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে আহরণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, ভারতচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গীও মধুসূদনকে প্রভাবিত করিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে হীরা মালিনীর খেদোক্তি এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ কৈকেয়ীর খেদোক্তি প্রায় হুবহু এক। এইভাবে ভারতচন্দ্র পুরাতন ও নূতনের সন্ধিক্ষণে আপন মহিমায় ভাস্বর হইয়া রহিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ ও অন্নদামঙ্গল: বাংলা সাহিত্যের প্রায় জন্মলগ্ন হইতেই মঙ্গলকাব্যের অবির্ভাব ঘটিয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন হইলেও এইগুলির বক্তব্য এক। মঙ্গলকাব্যের রচনারীতি একটি গতানুগতিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠিক কোন্ সময়ে বাংলা মঙ্গল-কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। বাংলাভাষার উন্মেষকাল হইতেই বাংলাদেশের গ্রাম্য কবিগণ কর্তৃক গান এবং ছড়ার আকারে বিভিন্ন ধর্মমূলক এবং ঐতিহাসিক কাহিনী রচিত হইয়া জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ রচয়িতা অথবা গায়েনের মুখে মুখে গীত হইয়া প্রচারিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত কবির প্রতিভাস্পর্শে লোক-সাহিত্যের সরলতা

কৃতিত্ব অর্জনে দেবতাদের কৃপার উপরই নির্ভর করিতেন, তাই দেবতার নামাঙ্কিত ও আশীর্বাদপূত করিয়া তাঁহারই আদেশক্রমে কাব্যরচনা করিতেছেন এইরূপ মনে করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, দৈবাদেশে রচিত বলিয়া জানিলে তখনকার জনসাধারণ কাব্যটির বেশী সমাদর করিত। কবি ও শ্রোতার ব্যক্তিগত আস্থা বা পুরুষকারের অভাবই এই স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গের অবতারণা করিত বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ খণ্ডে কবি আপন বংশ-পরিচয়, জন্ম-তারিখ, বাসস্থানের নাম প্রভৃতি সংযোজিত করিতেন। 'দেবখণ্ডে' প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল, সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে সতীর আগমন, শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ ও সতীর দেহত্যাগে ক্রুদ্ধ শিবকর্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ ও শিবের প্রলয় নৃত্য, হিমালয়ের গৃহে সতীর নবজন্মলাভ, মদন ভস্ম, উমার তপস্যা ও শিবের সহিত বিবাহ, কৈলাস যাত্রা, শিব-গৌরী কোন্দল, প্রভৃতি পুরাণান্তর্গত শিবকাহিনীর লৌকিকরূপ। 'নরখণ্ড' হইল কাহিনী অংশ। স্বর্গের কোন দেবতা বা দেবী বিশেষ দেবতাকর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্যে আগমন করিয়া বিশেষ দেব বা দেবীর পূজার মাধ্যমে মর্ত্যে তাঁহার মহিমা প্রচারে সহায়তা করেন। তারপর তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। এই দেব-দেবীরা মর্ত্যের মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্যের মানুষের মত সুখ-দুঃখ সহ্য করিয়া যান। ইহার মধ্য দিয়া তৎকালীন যুগের সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 'বারমাস্যা' তাই প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যের আর একটি প্রচলিত সংস্কার। বিপদগ্রস্ত নায়ক বা নায়িকা দেবতার আশীর্বাদ লাভ করিবার জন্য চৌত্রিশটি বর্ণকে আদ্যক্ষর রাখিয়া যে স্তব করেন, তাহাই 'চৌতিশা' নামে পরিচিত।

এই প্রধান লক্ষণগুলি ছাড়াও মঙ্গলকাব্যের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন পাকপ্রণালীর বর্ণনা, নারীদিগের পতিনিন্দা, বিবাহাচার, বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তির বিস্তৃত বর্ণনা, বাংলাদেশের সওদাগরগণের বাণিজ্যযাত্রা, নগরবর্ণনা, প্রহেলিকা বা ধাঁধার সমাধানান্তে কোনও রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ, যুদ্ধবর্ণনা, দেবীর বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া নায়ক-নায়িকাকে ছলনা এবং নায়কের শাস্তি বর্ণনাপ্রসঙ্গে মশান বা শ্মশানের উপস্থাপনা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সেইযুগের মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে অনুসরণ করিয়া আপন আপন কাব্য রচনা করিতেন। এই কারণেই মঙ্গলকাব্য-গুলি গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিচিত্র রসাবেদনের অভাবে ইহাদের

সমাদরও কমিয়া আসিতেছিল। ভারতচন্দ্রই প্রথম এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নূতনত্বের আরোপ করিয়া মঙ্গলকাব্যে মরা গাঙ্গে জোয়ার ডাকাইলেন। অতি সাধারণ বস্তুকে অসাধারণের মহিমায় ভূষিত করা, বর্ণহীন একঘেঁয়েমির মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের মত চমৎকৃতির সৃষ্টি একমাত্র সার্থক প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। ভারতচন্দ্র এই প্রতিভার যথার্থ অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি মঙ্গলকাব্যের উপরিবর্ণিত সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে মূল কাঠামোকে বজায় রাখিয়া কাব্যকে 'নবরসতর' করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার সরস ভাষার কারুকার্যে মঙ্গলকাব্যকে নূতনরূপ দান করিতে গিয়া গ্রন্থোৎপত্তির গতানুগতিক কারণ বর্ণনার পরিবর্তে অন্নপূর্ণার বন্দনা সমাপনান্তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগান করিয়াছেন। বর্গীর উৎপাতে বাংলা বিপর্যস্ত। কৃষ্ণচন্দ্র ধার্মিক রাজা তবুও—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি॥

তখন ধার্মিক কৃষ্ণচন্দ্রের এই বিপদে দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদার টনক নড়িল।

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিও ভয়।
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥

স্বপ্নে দেবী আরও বলিলেন :—

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥

তখন—

সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর॥

রাজসভার কবি ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়। মঙ্গলকাব্য এই বিভিন্ন ধারার অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের একটি সুবিপুল সময়কাল ব্যাপিয়া এই মঙ্গলকাব্যের অবস্থান। এই সময়কালকে মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবযুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। দ্বিতীয় যুগের বিস্তৃতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। মঙ্গলকাব্যগত বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যে এই যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি একটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। এই যুগকে সৃজনযুগ বলিয়া অভিহিত করিলে তাহার পরবর্তী যুগকে মঙ্গলকাব্যের অন্তিমযুগ বলা যায়। এই যুগে মঙ্গলকাব্য তাহার রচনাব উদ্দেশ্য বর্জিত হইয়া বিশুদ্ধ কাব্যরসে সিক্ত হইয়া রচনাগুলিকে কাব্যসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য এই যুগকে মঙ্গল-কাব্যের ঐশ্বর্য যুগ বলিতেও বাধা নাই। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত।

এই সকল যুগের মঙ্গলকাব্যই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া বিশেষ একটি কাঠামোর ভিত্তিতে রচিত। মঙ্গলকাব্য conventional. সকল কবিই ঐ বিশেষ কাঠামোটিকে অবলম্বন করিয়া কাব্যের সূচনা করিয়াছেন। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই প্রধানতঃ চারিটি ভাগ লক্ষ্য করা যায় বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। বন্দনা অংশে সকল পৌরাণিক দেবদেবীর স্তুতি করিয়া কাব্যকাহিনীর অন্তর্গত দেবতা বা দেবীর বন্দনাগান। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণে' দেখা যায় দেবীর স্বপ্নাদেশই কবিকে গ্রন্থরচনায় প্রেরণা জোগাইয়াছে। এই অংশেই কবি আপন বংশপরিচয়. জন্ম-তারিখ, আবাসস্থলের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 'দেবখণ্ডের' আলোচ্য হইল সৃষ্টি রহস্য, দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়-গৃহে নররূপে জন্মলাভ, মদনভস্ম, উমার তপস্যা, বিবাহ, কৈলাসযাত্রা, শিব-গৌরী কোন্দল প্রভৃতি পৌবাণিক শিব-কাহিনী।

'নরখণ্ড'-এ মূল কাহিনীব বর্ণনা। স্বর্গের কোন দেবতা বা দেবী বিশেষ দেবতার পূজাপ্রচারোদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যে আসেন। দেবী বা দেবমাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা সমাপনান্তে তাঁহারা স্বর্গে ফিরিয়া যান। কাহিনীর নায়ক-নায়িকা শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যে দেবতা বা দেবীর নিকট হইতে ছলে, বলে, কৌশলে কি করিয়া ঐ বিশেষ দেবতা আপনার পূজা গ্রহণ করেন তাহারই বর্ণনায় মূল কাহিনী অংশ সমৃদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাকপ্রণালীর বর্ণনা, নারীদিগের পতিনিন্দা, বিবাহাচার, বিশ্বকর্মার শিল্পকৃতির বিস্তৃত বর্ণনা, বাংলার

পড়িয়াছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যকে সরস করিবার জন্য ছন্দে বৈচিত্র্য আনিলেন। ভাবানুযায়ী ছন্দ-নির্বাচনেই যে তিনি শুধু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এমন নয়, এই ছন্দকে তিনি সার্থক শব্দ-সমষ্টির মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার শব্দ নির্বাচন বা শব্দলীলা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যেরই ফলশ্রুতি। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী এই সব রকমের শব্দই তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সতীর দেহত্যাগের সংবাদে বিচলিত শিব দক্ষালয়ে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বিষাদ-ক্ষুব্ধচিত্তের সম্যক প্রকাশ ঘটাইবার জন্য কবি সংস্কৃত ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দেব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট্ সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥

শব্দেব ঘনঘটা মহাদেবের রুদ্ররূপটিকে অতি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

ভূতপ্রেতগণ দক্ষযজ্ঞনাশে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের উন্মত্ত কলরোল কবি তূণক ছন্দের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥

এই সকল ছন্দ যেমন ভাবানুযায়ী সার্থক হইয়াছে তেমনি উহাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী প্রয়োগনৈপুণ্যে অতিশয় অর্থবহ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম উদাহরণে গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গলীলা এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ভূতপ্রেতগণের নৃত্যের উন্মত্ততা যেন উপযোগী রাগিণীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ-ব্যবহারে ভারতচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। দেবী অন্নদা শিবকে অন্নদান করিতেছেন, ভোজনের আনন্দে শিব মাতিয়া উঠিয়াছেন,

পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচমচিয়া॥

গান গীত হইয়াছে সেই দেবী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ-পরায়ণা। মহারাজ সেই দেবীর পূজার্চনার রাজসিক ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। এইরূপ দেবীর বন্দনা গানে ভারতচন্দ্রের ভাষা যে স্বভাবতই উজ্জ্বল ও আড়ম্বরপূর্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতচন্দ্রের শিব ও অন্নপূর্ণা ঐ যুগের মানবিক বেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই দেখি, অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপবর্ণনার পার্থক্য অতি অল্পই। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কথা উল্লেখ করিতে পারি। রাধা ও কৃষ্ণের পবিত্র প্রেমলীলাকে অবলম্বন করিয়া উক্ত কাব্যে যে ভাবে মানুষের আদি রিপুর চর্চা করা হইয়াছে তাহাতে দেবভক্তি কি পরিমাণ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পল্লী বাংলার আসবে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ধামালীরূপে গীত হইত। ভারতচন্দ্রেব বিদ্যাসুন্দর কাব্য শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের উন্নত সংস্করণ মাত্র। আসলে দেবতার প্রতি ভক্তি-নিবেদন, জনগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পবিত্র 'মঙ্গল' সঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতিব মাধ্যমেব দণ্ড ধরিয়া ভারতচন্দ্র রাজা এবং রাজানুচরবর্গের বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে চেতাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ফলে তিনি যে সব দেবচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে মনুষ্যচরিত্রের প্রতিভাস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ বর দেখিয়া মেনকার যে বিলাপ এবং নারদকে গালাগালি করা তাহাতে দেবচবিত্রেব মহিমা কোথায়? শিবের শ্লথ চরিত্র লইয়া গৌরীর ঠাট্টা, বরবেশী বুড়া শিবেব উলঙ্গ মূর্তি দেখিয়া নারীদের মধ্যে আলোড়ন, অন্নদার জরতী বেশ প্রভৃতি চিত্রগুলিতে অলৌকিক স্বর্গধামের মহিমা অন্বেষণ বৃথা। ঈশ্বরী পাটনী তো অন্নদামঙ্গলের সার্থক মনুষ্যচরিত্র। ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনাব উদ্দেশ্য অবগত হইলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, দেবলীলার পটভূমিকায় নরজগতের কাহিনী বিস্তারই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই তাঁহার কাব্যে দেবচরিত্রের মহিমা অপেক্ষা মনুষ্যচরিত্রই যে অধিকতর সজীব হইবে তাহাতে সন্দেহ কোথায়!

মঙ্গলকাব্যের ভক্তিগত প্রেরণা: (অন্নদামঙ্গলকাব্য রচনা করিতে গিয়া ভারতচন্দ্র অবশ্যই এই কাব্যধারার অতীত যুগেব দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নূতন বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়া ই কাব্যধারায় যে নূতনত্বের প্রবর্তন করা সম্ভব নয় তাহা তাঁহার মত শিল্পসচেতন কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই।) যে ভক্তিমূলক মনোভাব হইতে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি সেই ভক্তির স্রোত যে বহুকাল পূর্বেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সে সসম্মানে সেই রমণীকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিল। ঈশ্বরী পাটনী জানিত না যে, স্বয়ং জগদীশ্বরী আজ তাহাকে কৃপা করিতে আসিয়াছেন। অতঃপর আরম্ভ হইল সন্তানের সঙ্গে জগজ্জননীর মধুর রহস্যালাপ। সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের মধ্যে এই অংশটিকে উজ্জ্বলতম রত্ন বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। রাজসভার চাতুর্য ও কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া ভারতচন্দ্র এখানে জননীর নিকট স্নেহভিক্ষু সন্তানের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের শাশ্বত বৈশিষ্ট্যটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেঁউতি সোনায় পরিণত হওয়ায় পাটনী বুঝিতে পারিল,

এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥

দেবী তীরে নামিয়া গজ গমনে পূর্বমুখে চলিতে লাগিলেন। তখন,

সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥

পাটনীর চক্ষে তখন জলধারা। দুই হাত জোড় করিয়া সে কহিতে লাগিল,

সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখি সেঁউতীতে থুয়েছিল পদ।
কাঠের সেউঁতী মোর হৈলা অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥

দেবী ইতিপূর্বে পাটনীকে রহস্যচ্ছলে যে পরিচয় দিয়াছিলেন মূর্খ পাটনী তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? দেবী তখন পাটনীকে তাঁহার পরিচয় খুলিয়া বলিলেন এবং তাহাকে

বর মাগো মনোনীত যাহ চাহ দিব॥

ধন, জন, রাজ্যপাট যাহা খুসী পাটনী চাহিতে পারে। কালকেতুকে এই দেবীই একুশ ঘড়া সুবর্ণ মোহর দিয়াছিলেন। ঈশ্বরী পাটনী ইচ্ছা করিলে তাহার চেয়ে আরও অনেক বেশী কিছু চাহিয়া লইতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বরী পাটনীর আবেদন অতি অকিঞ্চিৎকর:

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥

অন্নদামঙ্গল

প্রথম খণ্ড

গণেশবন্দনা

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।[১]
খর্ব্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর ॥
বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল ॥
হেলে শুণ্ড[২] বাড়াইয়া সংহার সমুদ্র পিয়া
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্ব সৃষ্টি
ভাল খেলা খেল দয়াময় ॥
বিধি বিষ্ণু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা
সৃষ্টি পুন করহ সংসার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন্ ব্রহ্ম
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার ॥
যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে না পারি কভু
বিধি হরি হর নাহি জানে।

১। শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ২। শুঁড়

কৃপা কর কমললোচন।
জগন্নাথ মুরহর[১] পদ্মনাভ গদাধর
মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ॥
রাম কৃষ্ণ জনার্দ্দন লক্ষ্মীকান্ত সনাতন
হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন।
শ্রীনিবাস দামোদর জগদীশ যজ্ঞেশ্বর
বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ সুশোভিত চারি ভুজ
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহব পদ নিরুপম কোকনদ
রত্ননূপুর বাজে তায় ॥
পরিধান পীতাম্বব অধর বান্ধুলীবর[২]
মুখসুধাকরে সুধা হাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সবস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব
সনকাদি যত ঋষিগণ।
নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণগানে
পঞ্চ মুখে গান পঞ্চানন ॥
কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায় ॥
ভৃঙ্গেব হুঙ্কার রব কুহরে কোকিল সব
পূর্ণ চন্দ্র শরদযামিনী।

১। মুরহর—মুরহা, মুর নামক দৈত্যকে যিনি হনন করিয়াছেন।

২। বাঁধুলী ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; বাঁধুলী একপ্রকার ফল। সাদা, কাল, পীত ও লাল—ঐ ফল এই চার বর্ণেরই হয়। লাল বাঁধুলীর সঙ্গে সুন্দরীদের অধরের তুলনা করা হয়।

লক্ষ্মীবন্দনা

কমল কোরক কদম্বনিন্দক
করিস্থতকুম্ভ উচ্চ।
কাঁচুলি রঞ্জিত অতি সুশোভিত
অমৃতপূরিত কুচ ॥
সুবলিত ভুজ সহিত অম্বুজ
কনক মৃণাল রাজে।
নানা আভরণ অতি সুশোভন
কনক কঙ্কণ বাজে ॥
কোটি শশধর বদন সুন্দর
ঈষদ মধুর হাস।
সিন্দূরমার্জ্জিত মুকুতারঞ্জিত
দশনপাঁতি প্রকাশ ॥
সিন্দূর চন্দন ভালে সুশোভন
রবি শশী এক ঠাঁই।
কেবা আছে সমা কি দিব উপমা
ত্রিভুবনে হেন নাই ॥
শিরে জটাজূট রতন মুকুট
অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতীমালায় বিজুলি খেলায়
ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে ॥
কহি জোড়করে উরহ আসরে
ভারতে করহ দয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে রাখ রাঙ্গা পায়ে
অভয় দেহ অভয়া ॥

লক্ষ্মীবন্দনা

উর লক্ষ্মি কর দয়া।
বিষ্ণুর ঘরণী ব্রহ্মার জননী
কমলা কমলালয়া ॥

গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
নব গ্রহ দিক্‌পাল দশ ॥
জিনি কোটি শশধর কিবা মুখ মনোহর
মণিময় মুকুট মাথায়।
ললিত কবরীভার তাহে মালতীর হার
ভ্রমর ভ্রমরী কল গায় ॥
বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন আদি দেব ঋষিগণ
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।
আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান।
ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ-গুণগান
নায়কের পূর্ণ কর আশ।
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ্ হর
গায়কের কণ্ঠে কর বাস ॥
স্বপনে রজনীশেষে বসিয়া শিয়রদেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে কত গুণ কব অল্পে
নিজ গুণে হবে বরদায়
নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ॥

গ্রন্থসূচনা

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা ॥

ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিব যবন সব সমূল নির্ম্মূল॥
নিষেধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে।
বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে॥
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর।
না ছাড় সংহারশূল সংহর সংহর॥
আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।[১]
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনের করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত।[১]
বর্গি মহারাষ্ট্রি আর সৌরাষ্ট্রি প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥[২]
পলাইয়া কোঠে[৩] গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥

১। ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

২। ঝি-বউ

৩। দুর্গের মত সুরক্ষিত প্রাসাদ

দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত[১] সিত[২] হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন।
পঞ্চ দেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায়॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর অবতার।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ আকার॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই।
ফুলের মুখটী জয়গোপাল জামাই॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুববাজ রাজকায়।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায়॥
জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম।
সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটী।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী॥
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।
মুর্খটী অনন্তরাম চট্ট বলরাম॥
বলরাম চট্টসুত ভাগিনা রাজার।
সদাশিব রায় নাম শিব অবতার॥
দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখয্যের সুত।
রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত॥
ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণধাম।
বাঁড়ুরি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥
মুর্খ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার।
পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার॥

১। কৃষ্ণবর্ণ ২। শুক্লবর্ণ

ঘড়ীয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন।
চেলা খানেজাদ[১] যত কে করে গণন॥
সেফাহীব[২] জমাদার মামুদ জাফব।
জগন্নাথ শিরপা[৩] করিলা যাব পব॥
ভূপতিব তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফব হুসেন মোগল কর্ণসম॥
হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেনসুত।
ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥
যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আব যত।
ভোজপুবে সোযার বোঁদেলা[৪] শত শত॥
কল্লমালে[৫]বঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।
তাব ভাই বামচন্দ্র বাঘব ধীমান॥
আমীন বাঢ়ীয দ্বিজ নীলকণ্ঠ বায়।
দুই পুত্র তাহাব তাহাব তুল্য কায়॥
বড বামলোচন অশেষ গুণধাম।
ছোট বামকৃষ্ণ বায় অভিনব কাম॥
দেয়ানের পেশকাব বসু বিশ্বনাথ।
আমীনেব পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ॥
বত্নগজ আদি দিগ্‌গজ সংখ্যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥
হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥
অধিকার রাজাব চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥

১। ক্রীতদাসের সন্তান ২। সিপাহী ; সৈন্য। ৩। শিরোপা-পারিতোষিক।
৪। বুন্দেলখণ্ড হইতে আগত সৈন্য। ৫। সমস্ত রাজস্বের।

ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥

গীতারম্ভ

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি॥
বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥
গুণ সত্ত্বতমোময়ে হরিহরকমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ।
শুন বিধি হরি হর তিন জনে পরস্পর
করেন কারণ জলে জপ॥
তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।

পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে ॥
পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচা গন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইলা বিধাতা ॥
বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাঁই
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া ॥
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে বসিল মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ॥
বিধির মানস সুত দক্ষ মুনি তপযুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া।
তার গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গল ধাম
জনম লভিলা মহামায়া ॥
নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি ॥
সদাশিব নিন্দা করে মহা ক্রোধ হৈল হরে
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।
দক্ষেরে বিধাতা বাম না লয় শিবের নাম
সদা নিন্দা করে কটু ভাষে ॥
আরম্ভিয়া দেবযোগ নিমন্ত্রিল দেবভাগ
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে।
যাইতে দক্ষের বাস সতীর হইল আশ
ভারত কহিছে জোড় করে ॥

ভৈরবীরূপা

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণভূষণা॥
অক্ষমালা[১] পুথী[২] বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর॥

ছিন্নমস্তা

দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত॥
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাজে।
তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে॥
বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গ কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥

ধূমাবতী

দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন।

১। রুদ্রাক্ষমালা ২। পুস্তি

পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার॥
লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হইলা সতী।
গৌর বর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মূবতি॥
মোহিত মহেশ মহামায়াব মায়ায়।
যে ইচ্ছা কবহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীবে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষেব মন্দিরে॥
প্রসূতি সতীরে দেখি কালীয়বরণ।
কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন॥
আহা মরি বাছা সতি কালী হইয়াছ।
ছাড়িবে আমাবে বুঝি মনে করিয়াছ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে।
শিবনিন্দা শুনে তুমি শরীর ছাড়িবে॥
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ।
তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস॥
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেল সত্বরা হইয়া॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে॥

লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষদমন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষগুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥

শিবের দক্ষালয় যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ণ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্টসদ্যোমরা[1] হস্তিছালা ॥
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥
থিয়া তাথিয়া তাথিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কারে হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥

১। কটীকট্ট—কটিদেশের মধ্যস্থল বা ক্ষীণভাগ

বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে ॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে ॥
যক্ষ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
ঊর্দ্ধহাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে ॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে ॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে ॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে ॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি[১] ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥
হাস্যতুণ্ড[২] যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মুতিছে।
পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুঁতিছে ॥
রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হুল থূল কূল কূল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে ॥
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে ॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের[৩] ছন্দ বন্ধ বাড়িছে ॥

১। ঘৃত। ২। হাসিমুখ।

৩। ইহাতে প্রত্যেক চরণে ১৫টি অক্ষর থাকে। এই ছন্দে অক্ষরগুলি 'গুরু+লঘু+গুরু' এবং 'লঘু+গুরু+লঘু'—এই ক্রমে দুইবার আবর্তিত হয় এবং শেষে 'গুরু+লঘু+গুরু' অক্ষরের সমাবেশ থাকে। অক্ষরগুলি সাজাইলে গুরু+লঘু—ক্রমে ইহারা সাতবার পুনরাবর্তিত হয় এবং শেষের অক্ষরটি গুরু হয়। ইহাতে প্রতি চরণে মাত্রাসংখ্যা থাকে ২৩। প্রতি যুগ্ম অক্ষরের পর বিরাম লওয়া যায় বলিয়া ছন্দটি শ্রুতিমধুর। ইহা সংস্কৃত ছন্দ।

বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিলে সেহ নহে তাব মত ফল॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী॥
সতীব জননী আমি শাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা দশা হইল আমাব॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা॥
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়॥
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন॥
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব[১]॥
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান॥

১। নরক বিশেষ অর্থাৎ শাস্তিভোগ করা।

কাশ্মীরেতে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায়।
ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ॥১৭
রত্নাবলী স্থানে ডানি স্কন্ধ অভিরাম।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥১৮
মিথিলায় বাম স্কন্ধ দেবী মহাদেবী।
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি ॥১৯
চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥২০
আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মানসরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে ॥২১
উজ্জানীতে কফোণি[১] মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবি ॥২২
মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।
স্থাণু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥২৩
প্রয়াগেতে দু হাতের অঙ্গুলী সরস।
তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ ॥২৪ ইং ৩৩
বাহুলায় বাম বাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব ॥৩৪
মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ॥৩৫
জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন।
ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ॥৩৬
আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে।
শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ॥৩৭
বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ।
দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্ব সিদ্ধি সাথ ॥৩৮

১। কনুই।

কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

শিববিবাহের মন্ত্রণা

উমা দয়া কর গো। বিষম শমনভয় হর গো॥
পাপেতে জড়িত মতি কাতর হয়েছি অতি
পতিতপাবনী নাম ধর গো।
মা বলিয়া ডাকি ঘন শুনিয়া না দেহ মন
গুহ গজাননে বুঝি ডর গো
তুমি গো তারিণী তারা অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চর গো।
রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্র ঋণে তর গো॥

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর॥
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব॥
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব॥
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা॥
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।[১]
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে শর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ॥

১। শিবপুরাণ অনুসারে মাতা মেনকাকর্তৃক 'উ (ও) মা (না)' এইরূপে তপশ্চর্যা হইতে নিবারিত হওয়ার জন্যই পার্ব্বতীর নাম হয় উমা।

নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
ছুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নাবদ।
সম্ভ্রমে বাহিবে আসি বন্দিলেন পদ॥
হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে।
সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে॥
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়।
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়॥
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে।
অখিলভুবনমাতা জানিতে কে পারে॥
বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা।
শিব পতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে।
ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মনে মনে হাসি হেন কালে আসি
নারদ হইলা সমুখ।
নারদে দেখিয়া সলজ্জ হইয়া
ধর হৈলা হেঁটমুখ॥
খুড়া খুড়া কয়ে দণ্ডবত হয়ে
কহিছে নারদ আসি॥
দক্ষগৃহ ছাড়ি হেমন্তের বাড়ি
জনমিলা সতী আসি॥
বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া
আনন্দে কর বিহার।
শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার॥
মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত
বর হয়ে কবে যাবা।
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা॥
শুনি মুনি কয় এমন কি হয়
সর্ব্ব দেবগণে কহ॥
প্রায় হয়ে বুড়া ভুলিয়াছ খুড়া
দিন দুই স্থির রহ॥
শান্ত হৈলা হর যতেক অমর
এল যথা পশুপতি।
কামের মরণ করিয়া শ্রবণ
কান্দিয়া আইলা রতি॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর॥

যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে
এমন না দেখি কোন কালে ॥
শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন ॥
অনলে শরীর ঢালি তথাপি রহিল গালি
মদন মরিলে মৈল রতি।
এ দুঃখে হইতে পার উপায় না দেখি আর
মরিলেহ নাহি অব্যাহতি ॥
অরে নিদারুণ প্রাণ কোন্ পথে পতি যান
আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীবরাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥)
অরে রে মলয় বাত তোরে হৌক বজ্রাঘাত
মরে যা রে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥
কোথা গেলা সুররাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম ॥
বিরহ সন্তাপ যত অনলে কি তাপ তত
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয় কাঁদিলে কি আর হয়
এই ফল বিরহীর শাপে ॥

নারদ রসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
সাজাইতে গেলা বর।
বসি ছিলা হর উঠিলা সত্বর
নারদ কহে তৎপর॥
জটাজূটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায়
কন্যার মা হবে লোভা॥
কস্তুরী কেশরে চন্দনে কি করে
ঘন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে যে শোভা ফণীতে
হেন বর কোথা পাই॥
ফুলমালা যত শোভা দিবে কত
যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা জগমনোলোভা
যে শোভা বাঘের ছালে॥
রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার
যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ কব কোটি গুণ
আমি মেনকার কাছে॥
অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া
ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবত বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ
উপবাস তবে সবে॥
এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥

ঝুপ ঝুপ ঝাপ হুপ হুপ দাপ
লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধূমধাম হাঁক হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো।
থাবায় থাবায় মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভালো॥
করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি
লক লক লক জিহি।
করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি
কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে
কে মানে কাহার বোল॥
তরু উপাড়িয়া গিরি উখাড়িয়া[১]
কৈল প্রলয়ের ঝড়।
বরযাত্রগণ লইয়া জীবন
পলাইল দিয়া রড়॥
ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তায়
দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি
গেলা হেমন্তের ঘরে॥
হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ
বসি পুরোহিত সাথ।

১। আপটিয়া ধরে। ২। উৎপাটন করিয়া।

যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।
আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঢেঁটা।[১]
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা॥
তার সই বলে থাক জানি লো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখিঠারে॥
ইহার হইয়া কহে উহার মকর।[২]
গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর॥
চারিমুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন।
তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রৈল কেন॥
সে বলে নাফানী[৩] আ লো না জান আপনা।
চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা॥
এইরূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥
দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেঁট মুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত॥
হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত॥
ভূতভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ।
বুড়ার নিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতাগঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥

১। দুষ্ট; ২। সমবয়স্কা সঙ্গিনীদিগের বন্ধুত্বজ্ঞাপক কৃত্রিম বা পাতানো নাম;
৩। যৌবনগর্ব্বিতা

ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো।
ভেভাচাকা[১] লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো[২] ॥
নূতন ঘোটনা কুঁড়া[৩] দিয়াছে বিশাই[৪]।
আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই ॥
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর।
সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার ॥
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া ॥
তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥
অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার।
ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার ॥
মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা ॥
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দুধ কুসুম্ভায়[৫] আজি হয়েছে বাসনা ॥
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত।
সকলে প্রসাদ পাবে ঘোট-তারি মত ॥
শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে।
নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে ॥
বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া।
ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ হৈল কুঁড়া ॥
দু হাতে ঘোটনা দুই পায়ে কুঁড়া ধরি।
ত্রিপুরমর্দ্দন নাম মনে মনে স্মরি ॥
তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক।
ঘর্ঘর ঘুরূন ঘোর ঘন ঘন ডাক ॥

১। হতভম্ব ; ২। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ; ৩। সিদ্ধি ঘুঁটিবার আধার ;
৪। বিশ্বকর্ম্মা ; ৫। সিদ্ধিদ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাদ্যসামগ্রী।

হুঙ্কার ছাড়িয়া রসে মগন হইয়া।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া॥
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দীরে।
ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে॥
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত।
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিত॥
হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই।
বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই॥
অসংখ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল।
সহচরগণ সবে ভাবিতে লাগিল॥
শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও।
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও॥
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥
আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা॥
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ।
অগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ॥
এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী[১]।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি॥
আমরা নকুল করি এমন কি আছে।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব॥
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই।
যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই॥

১। বুড়ী মা।

অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব পড়িল যেখানে।
ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে ॥
তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
আর বার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া ॥
শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে।
সমভাবে দোঁহে এক হইবে কেমনে ॥
পাঁচ মুখ তোমাব আমার এক মুখ।
সমভাবে অর্দ্ধ ভাগে তুমি পাবে দুখ ॥
দশ হাত তোমার আমার দুটি হাত।
সমভাবে অর্দ্ধ ভাগে হইবে উৎপাত ॥
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার।
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার ॥
ঊর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই ॥
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে।
চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে ॥
পঞ্চ তালে নাচিতে অধিক আট হাত।
দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত ॥
এত বলি একমুখ দ্বিভুজ হইলা।
সাক্ষী করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা ॥
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইতে নাহি আন ॥
দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে ॥
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী ॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর ॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
পরম্পরা পরম্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
এইরূপে দুই জনে বাড়িছে বাকছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরীকন্দল

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥

আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল[১] দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষপানে নাহি লয় কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ-হিয়া ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া
ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে॥

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক[২]॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দূকের কুঁজি[৩]॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ হি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥

১। ছাওয়াল; ছেলে; শিশু;
২। উইঢিপি; ৩। চাবি।

প্রকাশিয়া তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্রে
লোকের যন্ত্রণা হর ॥
তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে
চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে ।
দ্বিতীয়া অন্বিত[১] অষ্টাহ সঙ্গীত
বিসর্জ্জন নবমীতে ॥
পূজিবে যে জনে তাহার ভবনে
হইবে লক্ষ্মী অচলা ।
আর যত আছে সব হবে পাছে
কহিবে অষ্টমঙ্গলা ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ দেবীপুত্ররূপ
অন্নপূর্ণা ব্রতদাস ।
ভারত ব্রাহ্মণ কহে সুবচন
অন্নদা পুরাও আশ ॥

অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ

অন্নপূর্ণা জয় জয় ।
দূর কর ভবভয় ॥
তুমি সর্ব্বময় তোমা হৈতে হয়
সৃজন পালন লয় ।
কত মায়া কর কত কায়া ধর
বেদের গোচর নয় ॥
বিধি হরি হর আদি চরাচর
কটাক্ষেতে কত হয় ।
ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদছায়া
ভারত বিনয়ে কয় ॥

১। যুক্ত; মিলিত।

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা

জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা।
বাজত ডমরু পিনাক রসালা ॥
নাচত ভূত বাজাওত ভৈরব
গাওত তাল বেতালা।
নন্দী কহে তাতা- কার মনোহর
ভৃঙ্গী বাজাওত গালা ॥
গঙ্গা ঝরে জল চাঁদ সুধারস
অনল হলাহল জ্বালা।
ভারতকে হর শঙ্কর মূরতি
নাশ কপাল কপালা ॥

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান ॥
ববম্ ববম্ বম ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম শিঙ্গা বাজে ভাল ॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে ॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা[১] ॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ[২]।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥

১। রঙ্গ-তামাসাপ্রিয় চেঙ্গড়া ; ২। কৌতুককারী।

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি ॥
আমি লক্ষ্মী সর্ব্বঠাঁই মোর ঘরে অন্ন নাই
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।
শুনিয়া শঙ্কর কন ফিরিলাম ত্রিভুবন
এই কথা সকলের ঘরে ॥
গুমান' হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভেতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া ॥
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই তবু অন্ন নাহি পাই
কপালে দিলেক বিধি ছাই ॥
কত সাপ আছে গায় হাভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি বধে ॥
কপালে অনল জ্বলে সেহ না পোড়ায় বলে
না জানি মরিব কি ঔষধে ॥
ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ।
যার নারী সুতা সুত সদা অন্নকষ্টযুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ।
দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ
কেন শিব করহ বিষাদ।

১। গর্ব্ব; দেমাক।

সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের[১] মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
ভাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম ববম বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥

১। আহ্লাদ; সাধ।

বিশ্বকর্ম্মে হর কহিলা সত্বর
শুন রে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি বসিবেন কাশী
দেউল দেহ বানাই॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনি নিজ পুণ্য গুণি
দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।
অন্নদা মূরতি নিরুপম অতি
নিরমায় সাবধান॥
রতন দেউল ভুবনে অতুল
কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ বন্ধান অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ
দেখি সুখী কৃত্তিবাস॥
দেউল ভিতরে মণিবেদীপরে
চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা গড়িল অন্নদা
অনন্ত নামমহিমা॥
মণিময়চ্ছদ গড়ে কোকনদ
অরুণচিকণশোভা।
ভুবনমণ্ডল করয়ে উজ্জ্বল
মহেশের মনোলোভা॥
তাহার উপরি পদ্মাসন করি
অন্নদামূরতি গড়ে।
পদতল রঙ্গে দেখি অষ্ট অঙ্গে
অরুণ চরণে পড়ে॥
অতি নিরমল চরণ যুগল
সুশোভিত নখ ছাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ কলঙ্কে মলিন
কত শোভা হবে চাঁদে॥

মণিকরিকর উরু মনোহর
নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী।
ত্রিবলীর ভঙ্গে অনঙ্গের অঙ্গে
বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণী॥
শোভাসরোবর নাভি মনোহর
মদনশফরীধাম।
কামের কুন্তল অতি সুকোমল
রোমাবলী অভিরাম॥
স্বয়ম্ভূ শঙ্কর উচ কুচবর
সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে।
রতনকমল মৃণাল কোমল
সুবলিত ভুজ সাজে॥
কারণ অমৃত পলান্ন সঘৃত
পানপাত্র হাতা শোভে।
সমুখে শঙ্কর নাচেন সুন্দর
অন্ন খেয়ে অন্নলোভে॥
কোটি সুধাকর বদন সুন্দর
রতন মুকুট শিরে।
অর্দ্ধ শশী ভালে কেশ মল্লীমালে
অলি মধুলোভে ফিরে॥
অন্নদা মূরতি দেখি পশুপতি
বিশাইরে দিলা বর।
কৃষ্ণচন্দ্র মত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর॥

চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল ।
বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল ॥
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা ।
গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা ॥
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই ।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই ॥
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা ।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা ॥
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা ।
খরশুল্বা তপসিয়া গাঙ্গাস ইলিশা ॥
চারি পাড়ে বিকশ্বর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান ।
নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান ॥
অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর ।
করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর ॥
শেহলী পীয়লী দোনা পারুল রঙ্গন ।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন ॥
জবা জূতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন ।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন ॥
কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী ।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী ॥
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝিটী মুচকুন্দ ॥
আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল ।
খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল ॥
হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী ।
পাকুড় অশ্বত্থ বট বালা হরিতকী ॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুলফলধর ।
তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর ॥

মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর।
আইলা রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর ॥
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর।
অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
একে একে সবে শিবে দিলা দরশন ॥
চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন।
সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ ॥
বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ।
নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ ॥
আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস।
শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ ॥
যম আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত গৌতম।
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম ॥
কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল।
জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল ॥
দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ।
বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস ॥
ভার্গব চ্যবন ঔর্ব্ব হনু শাতাতপ।
উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ ॥
নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ।
বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন ॥
জয় শব্দ নমঃ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টারব।
বেদগান স্তুতি পাঠ মহামহোৎসব ॥
অন্নপূর্ণাপুরী আর মূরতি দেখিয়া।
পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া ॥
তোমার কৃপায় কথা শঙ্কর কি কব।
তোমা হৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব

শিবের পঞ্চতপ[১]

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড়॥
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদ্রিত নয়নে॥
দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট[২] উপবীত বিষধর॥
বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী॥
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত॥
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর॥
ভাদ্র মাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বান।
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান॥
আশ্বিনে অশেষ কষ্ট করেন কঠোর।
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর॥
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়।
অনশনে রজনী দিবস কত যায়॥
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার॥

১। কঠোর তপস্যা। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রমধ্যে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া, বর্ষায় বৃষ্টিতে এবং শীতে সিক্ত বসনে অবস্থান করিয়া এই তপস্যা করিতে হয়। ২। উত্তরীয় বিশেষ।

মধু মাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন ॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে ॥
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে।
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে ॥
ঘরে ঘরে নানা যন্ত্রে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান্ ॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে।
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে ॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুমছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে ॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস।
ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস ॥
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্যা নাম জয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত অভয়া ॥
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে ॥
মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মসুনির্ম্মিত অপার মহিমা ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার।
দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটি গুণ তার ॥
প্রতিমাপ্রভাবে যত দেবঋষিগণ।
ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন ॥
দৃষ্টিসুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া ॥

অন্নদা জয় জয় সকল দেবে কয়
ভুবন ভরি কোলাহল।
আনন্দে শূলপাণি করিয়া যোড়পাণি
পূজেন চরণকমল॥

দেউলবেদীপর প্রতিমা মনোহর
তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্ব্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্রধাম
লিখিলা আপনি বিধাতা॥

সম্মুখে হেমঘট আচ্ছাদি চারু পট
পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি বিধি।
সঙ্কল্প সমাচরি গন্ধাধিবাস করি
বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি॥

পূজিয়া গজানন ভাস্কর ত্রিলোচন
কেশব কৌষিকী চরণ।
পূজিয়া নব গ্রহ দিক্‌পাল দশ সহ
বিবিধ আবরণগণ[১] ॥

চরণ সরসিজ পূজিয়া জপি বীজ
নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বিবিধ উপাচার যত॥

সমাপি হোমক্রিয়া অন্নাদি নিবেদিয়া
মঙ্গল ইতিহাস গানে।
বাজায়ে বাদ্যগণ করিয়া জাগরণ
দক্ষিণা বিবিধ বিধানে॥

১। মূল দেবতার পূজার পর যে-সব দেবতাকে পূজা করা হয়।

কপালে চড়ক ফোঁটা[১] গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলি মৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠি গলে লম্বি মালা[২] করতলে
হাতে কানে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসার মৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল[৩] করঙ্গ[৪] পিবারে জল
হাতে আশা[৫] হিঙ্গুলবরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ
পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন যজ্ঞ হয়
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥
জগতের হিতে মন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয় দারা আপনার নয়
সেই ধর্ম্ম পরলোক সার॥

১। উদ্ধত; ২। বৈষ্ণবের জপমালা; ৩। লাউ;
৪। ভিক্ষাপাত্র; ৫। দণ্ড।

এইরূপে শিষ্য সঙ্গে সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে
চিরজীবী নরাকার লীলা।
একদিন দৈববশে শিষ্য সহ শাস্ত্ররসে
নৈমিষ কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ পূজা করে ত্রিলোচন
গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষমাল অর্দ্ধচন্দ্রে শোভে ভাল
কলেবরে বিভূতি মাখিয়া॥
শিব ভর্গ ত্রিলোচন বৃষধ্বজ পঞ্চানন
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব শর্ব্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ
দেবদেব ভীম গঙ্গাধর॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর ত্র্যম্বক ভূতেশ হর
রুদ্র পুরহর স্মরহর॥
এইরূপে ঋষি যত শিবের সেবায় রত
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয় ব্যাসের কি ভ্রান্ত হয়
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

শিবপূজা নিষেধ

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥
তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম ভজ রে।
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরী তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে॥

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরি-পদরজ রে ॥

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই ॥[১]
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম ॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে।
মোক্ষ ফল পাবে যদি ভজ নারায়ণে ॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রকৃতি তাহার ॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময় ॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয় ॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে ॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্ব দেবে হরি ॥

১। দেয়।

ব্যাসের বারাণসী প্রবেশ

এইরূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদিকেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
নানা রসে নাচিয়া গাইয়া ॥
কীর্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে গান করে নানা রঙ্গে
বাল্য গোষ্ঠ দান বেশ রাস।
পূর্ব্ববঙ্গ রসোদ্গার মাথুর বিরহ আর
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ ॥
বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানামতে গান বিষ্ণুপদ ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ঊর্দ্ধভুজে ঊর্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে
কেহ বলে হরি হরি বোল ॥
গোপকুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল।
একমনে ব্যাস কন শুনেন ভকতগণ
আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥
গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপী সাথ
শ্রীদামাদি সহচরগণ।
নন্দ যশোদাদি যত সব নিত্য অনুগত
কপিলাদি যতেক গোধন ॥

সুধাসমুদ্রের মাঝে চিন্তামণি বেদী সাজে
কল্পতরু কদম্বকানন।
নানা পুষ্প বিকসিত নানা পক্ষী সুশোভিত
সদানন্দময় বৃন্দাবন॥
কাম সদা মূর্ত্তিমান ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
রাগিণী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরসরঙ্গে
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত॥
গোলোক সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে
অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।
কংস আদি দুষ্টগণ করিবারে নিপাতন
দৈবকীজঠরে জন্ম ছলে॥
বসুদেব কংসভয় নন্দের মন্দিরে লয়
খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন।
পূতনা বধিতে চলে বিষস্তনপান ছলে
কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন॥
শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি যমল অর্জ্জুন ভঙ্গি
তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা।
মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে যশোদারে কুতূহলে
বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা॥
ননী চুরি কৈলা হরি যশোদা আনিল ধরি
উদূখলে লইলা বন্ধন।
গোচারণে বনে গিয়া বকাসুরে বিনাশিয়া
অঘ অরিষ্টের বিনাশন॥
বধ কৈলা বৎসাসুর কেশীরে করিলা চূর
বল হাতে প্রলম্ব বধিলা।
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি গোবর্দ্ধন গিরি ধরি
বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা॥

ব্যাসের শিবনিন্দা

হরি হরে করে ভেদ। নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥
একই কলেবর হইলা হরি হর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ।
উর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্ববেদে হরি॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে॥
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ[১] কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥
চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥

১। বাহুর স্তব্ধতা বা নিশ্চলতা।

ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরব লয়ে যায়॥
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনাব নামটি লুকাও॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল।
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস॥
পরদিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে[১] বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

১। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড অধ্যায়ে ব্যাসের শিববিদ্বেষের কাহিনী আছে। তবে তাহাতে ব্যাসকাশীর উল্লেখ নাই।

জগতজননী মাতা সবারে সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
আকাশ পবন জল অনল অবনী।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা॥
মেঘে করে যেমন সকলে জলদান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান॥
তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া॥
হরি হর প্রভৃতিরো শত্রু মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া॥
হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ॥
ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী' ধুতুরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহাগণ্ডগোল॥
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে পাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে॥
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥

১। সিদ্ধিথোর।

ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া ।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া ॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিস্থলে ।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে ॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে ।
পদনখে রহিয়াছে দশগুণ হয়ে ॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া ।
হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া ॥
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী ।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী ॥
চক্ষে যিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু ।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু ॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা ।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা ॥
রতন কাঁচুলি শাড়ী বিজুলী চমকে ।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে ॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে ।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে ।
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার ।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি ।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥
নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি ।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী ॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া ।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া ॥
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া ।
অতিবৃদ্ধ করি হয়ে তাহাতে রাখিয়া ॥

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমি ত পণ্ডিত।
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ভেদ প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপঃ ক্রিয়া।
জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়।
সেই রূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥
উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গব গর্জ্জে ফণী জিহি[১] লক লক।
অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীম নাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥

১। জিহ্বা।

শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥
পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥
পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে॥
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাস বর দিলা॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী হৈতে যান॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায়॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি[১]।
শিষ্য সহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

১। তাড়ানো।

এখানে মরিবে যেই সদ্যমুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে ॥
অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যায় ভর দিয়া
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥
মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই ॥
বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়
যাঁহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥
তাঁরে তুষি তপস্যায় বর মাগি তাঁর পায়
সকল পাইব এথা বসি।
পুরী করি মোক্ষধাম জাগাইব নিজ নাম
নাম থুব ব্যাসবারাণসী ॥
গঙ্গা মহাতীর্থ জানি গঙ্গারে এখানে আনি
আগে ত গঙ্গার কাছে যাই।
গঙ্গা সে শিবের পুঁজি[১] মোক্ষ-কপাটের কুঁজি
গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই ॥
গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষধাম জানিত কে তার নাম
আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।
আমি যদি ডাকি তারে অবশ্য আসিতে পারে
ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস ॥

১। চাবি :

ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার

ব্যাসের হইল ক্রোধ তেয়াগিয়া উপরোধ
গঙ্গারে কহেন কটুভাষে।
কালের উচিত কর্ম্ম বুঝিনু তোমার মর্ম্ম
তুমি মোরে হাস উপহাসে॥
তোমে অন্তরঙ্গ জানি করিনু যুগলপাণি
উপকারে আসিতে আমার।
তাহা হৈল বিপরীত আর কহ অনুচিত
দৈবে করে কি দোষ তোমার॥
আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে[১] পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥
উচিত কহিব যদি নদীমধ্যে তুমি নদী
পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত।
পুরাণে বর্ণিনু সেই পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥
জহ্নু মুনি করে ধরি পিলেক গণ্ডূষ করি
কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম।
সে দোষ থুইয়া দূরে জানাইনু তিন পুরে
জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম॥
শান্তনু রাজারে লয়ে ছিলি তার নারী হয়ে
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।
শান্তনুরে করি সারা হয়েছ শিবের দারা
তোর সমা পুণ্যবতী কেটা॥

১। দহে; হ্রদে।

পেয়েছ শিবের জটা তাহাতে সাপের ঘটা
কপালে বহ্নির তাপ লাগে।
চণ্ডী করে গণ্ডগোল ভূতভৈরবের রোল
কোন্ সুখে আছ কোন্ রাগে॥
স্বভাবতঃ নীচগতি সতত চঞ্চলমতি
কভু নাহি পতির নিয়ম।
যে ভাল ভজিতে পারে পতি ভাব কর তারে
সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম॥
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ জাতি কুল না'হি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবা দেই ক্ষীর পান করে যেই
পতি কর কোলে মাত্র পাও॥
আপনার পক্ষ জানি কহিলাম তোরে আনি
তুমি তাহে বিপরীত কহ।
তুমি মোর কি করিবা তোমার শকতি কিবা
বিষ্ণুপাদোদক বিনা নহ॥
শাপ দিয়া করি ছাই অথবা গণ্ডূষে খাই
ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান।
সিন্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মতেজ জানে সেই
অগস্ত্য করিয়াছিল পান॥
ব্যাসদেব এইরূপে মজিয়া কোপের কূপে
গঙ্গার করিলা অপমান॥
ভারত সভয়ে কহে মোরে যেন দয়া রহে
স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান॥

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে।
ব্যাসেরে ভর্ৎসিয়া কন মহাক্রোধ মনে॥
শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা।
এই অহঙ্কারে কাশীবাস না পাইলা॥
নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা।
শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা॥
তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি।
বেদমত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি॥
যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ।
আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ॥
তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী।
সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি॥
সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা।
শিবঅংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥
প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥
আমার জাতি দায় কে ধরিবে[১] তোরে।
কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে॥
বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ।
রচিয়াছ আপনি পরমজ্ঞানবান॥
তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম।
ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম॥
পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা যেই।
ব্রাহ্মণের লক্ষণে ব্রাহ্মণ বটে সেই॥

১। হিসাব দিবে।

নাহি জান তত্ত্ব নাহি বুঝ সত্ত্ব
শিব ব্রহ্ম সনাতন।
অজাত অমর অনন্ত অজর
আদ্য বিভু নিরঞ্জন॥
কার্য্য সাধিবারে এই যে আমারে
এখনি ব্রহ্ম কহিলে।
ব্রহ্ম বলিবার কি দেখ আমার
কেমনে ব্রহ্ম বলিলে॥
যাহারে যখন দেখহ দুর্জ্জন
তাহারে ব্রহ্ম বলহ।
এইরূপে কত কয়ে নানা মত
লিখিলা যত কলহ॥
বিশাই ধীমান গেলা নিজ স্থান
ব্যাসের হইল দায়।
কহিছে ভারত এ নহে ভারত
করিবে কথামথায়।

ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন

হব হর শঙ্কর সংহর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥
রঙ্গতরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয়
অর্পয় সর্পকলাপম্।
মহিষবিষাণরবেণ নিবারয়
মম রিপুশমনলুলাপম্॥
কনক কুসুম পরিশোভিত কর্ণে
কর্ণয় ভক্ত কপালম্।
নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব
দেহি পদং দুরবাপম্॥

এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে॥
যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা।
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা।
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি।
তবে সে হইবে মোর ব্যাসবারাণসী॥
এত ভাবি ব্যাসদেব মনে কৈলা স্থির।
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর॥
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য

গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ॥
ছয় মুখ কার্ত্তিকের গজমুখ গণেশের
মহেশের নিজে মুখপঞ্চ।

কত মুখ কত জন বেতাল ভৈরবগণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ ॥
লেগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অনুরাগী
বার মুখ তিন বাপে পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে ॥
অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার সনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়
পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ ॥
খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধিহত
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি
খেতে হবে খাও খাও খাও ॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে ॥
ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিলা মনে
ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে হাতে হৈতে হাতা পড়ে
উছট[১] লাগিয়া পদ টলে ॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্মে মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ ॥

১। হোঁচট।

ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ি আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কান ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে কত ভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
তোর মনে আমি বুঝি এখানে মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
উর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুখায়েছে আঁত॥

দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঁঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কানের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কান।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
বুড়ি না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভবারাণসী॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়॥

আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এইরূপে আমি তোরে বরদান দিয়া।
সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া॥
তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ।
কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ[১]॥
আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলীর।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর॥
ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার॥
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি[২] হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ।
অভিমান দূর করি চল নিজ বাস॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে।
এখানে মরিবে যেই গর্দ্দভ হইবে।
এই হৈল গর্দ্দভকাশী অন্যথা নহিবে॥
শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥

১। মন্দবুদ্ধি; ২। তিসিগাছের বাকলের সূতা হইতে যে বস্ত্রাদি তৈয়ার করে।

জয়া বিজয়ারে কন সহাসবদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যত বাণী।
কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর॥
রমণীসম্ভোগ তার কাননে হইবে।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর॥

বসুন্ধরে অন্নদার শাপ

কুবেরের অনুচর নাম তার বসুন্ধর
বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুই জনে হৃষ্টমনে ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে
নানা রস জানে নানা মায়া॥

কাম কাল বিষধর বিষে আমি জর জর
তুমি সে ঔষধ জান তার।
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে অন্নদার নাম লয়ে
আরম্ভিলা কত ফের ফার॥
অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে
যে সুখ পাইবে রতিসুখে।
দেবাসুরে সুধা লাগি সিন্ধু মথি দুঃখভাগী
সে সুধা সঘনে পেও মুখে॥
এই যে তুলিলা ফুল কে জানে ইহার মূল
বৃথা হবে জলে ভাসাইলে।
দেখ দেখি মহাশয় সম্ভোগে কি সুখ হয়
তোমায় আমায় গলে দিলে॥
মালা গাঁথি এই ফুলে দিয়া দেখ মোর চুলে
মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে।
বিপরীত রতি রঙ্গে পড়িলে তোমার অঙ্গে
ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে॥
এইরূপে বসুন্ধরে বিন্ধিয়া কটাক্ষ শরে
বসুন্ধরা মোহিত করিল।
কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে যে করে কামের বাণে
বসুন্ধর মদনে মাতিল॥
সেই ফুলে শয্যা করি সেই ফুলে মালা পরি
রতি রসে দুজনে রহিল।
এথায় যক্ষের পতি অন্নদাপূজায় মতি
একমনে ধ্যান আরম্ভিল॥
সংহৃতি বিজয়া জয়া কুবেরে করিয়া দয়া
অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান।
দেখিয়া পুষ্পের ব্যাজ[১] কুবের যক্ষের রাজ
সভয় হইল কম্পমান॥

১। বিলম্ব।

অন্নদা অন্তরে জানি কুবেরে নিকটে আনি
দয়ায় অভয়দান দিলা।
বসুন্ধরা বসুন্ধরে বান্ধি আনিবার তরে
ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রবেশিয়া কুঞ্জবন
বসুন্ধরা বসুন্ধরে ধরে।
সেই ফুলমালা সঙ্গে বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে
আনি দিল অন্নদা গোচরে ॥
অন্নপূর্ণা ক্রোধমনে শাপ দিল দুই জনে
যেমন করিলি দুরাচার।
মরত ভুবনে যাও মনুষ্যশরীর পাও
ভারতের এই যুক্তি সার ॥

বসুন্ধরের বিনয়

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধর।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ চরণের ছায়া
শাপে কৈলা জিয়ন্তেতে মরা ॥
অজ্ঞানে করিনু দোষ ক্ষমা কর অভিরোষ[১]
তুমি দেবী জগতজননী।
ভস্ম না করিলে কেন কেন শাপ দিলে হেন
কোন সুখে যাইব ধরণী ॥
অপরাধ অল্প মোর শাপ দিলা অতি ঘোর
নরলোকে কেমনে যাইব।
গর্ভবাস মহাদুখে ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুখে
মলমূত্রে ভূষিত থাকিব ॥

১। ক্রোধ।

পাতালেতে গিয়া বলি ছিল যেন কুতূহলী
গোবিন্দেরে হুয়ারি পাইয়া ॥
এত বলি বসুন্ধর যোগাসনে করি ভর
জায়া সহ শরীর ত্যজিল।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে চলিলা হুজনে লয়ে
রায় গুণাকর বিরচিল ॥

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে।
সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে ॥
বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে।
আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে ॥
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার।
কর্ম্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার ॥
সপ্ত দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী ॥
জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।
এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া ॥
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর ॥

হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি॥
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া।
হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে।
হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।
যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে॥
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥
বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥
এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে॥
যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে।
অভাগীর ঠাঁই বল কিবা কার্য্য আছে॥

পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই ।
ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই ॥
আপনি দিলেন হলু নাড়ীচ্ছেদ করি ।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে
বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল ।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ
পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল ॥
ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে ।
বনে মাঠে বেড়াইয়া কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া
বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে ॥
এক দিন শূন্য পথে অন্নপূর্ণা সিংহরথে
কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে কথোপকথনরঙ্গে
হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে ॥
মনে হৈল পূর্ব্বকথা আপনি আসিয়া তথা
মায়া করি হইলেন বুড়ী ।
কাট খড় জড়াইয়া সব ঘুঁটে কুড়াইয়া
রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ি ॥
হরিহোড় যেথা যান কাট ঘুঁটে নাহি পান
আট দিক আন্ধার দেখিলা ।
বিস্তর রোদন করি হরি হরি স্মরে হরি
বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা ॥

দেখেন বুড়ীর কাছে ঝুড়িভরা ঘুঁটে আছে
বোঝাবান্ধা কাট আছে তায়।
হরিহোড় কান্দি কহে বুড়ী মজাইল দহে
আজি বড় দেখি অনুপায়॥
কোথা হৈতে আসি বুড়ী ঘুঁটে লয়ে ভরে ঝুড়ি
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ
এ দুঃখের নাহি দেখি পার॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুঁটে না পাইনু মিছা বেলা মজাইনু
এ ছার জীবনে কিবা ফল॥
দয়া করি হরপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া
ছল কবি লাগিলা কহিতে।
কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া
অরে বাছা না পারি বহিতে॥
মঙ্গল হইবে তোর অতিদূরে ঘর মোর
ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্দ্ধেক আমার হবে অর্দ্ধেক আপনি লবে
দয়া করি চল মোরে লয়ে॥
হরিহোড় এত শুনি অর্দ্ধ লাভ মনে গুণি
মাথায় লইলা ঘুঁটেঝুড়ি।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে লড়ী[১] ধরে থেকে থেকে
আগে আগে চলিলেন বুড়ী॥
নিকটে হরির ঘর নহে অতি দূরতর
সাঁঝ কৈলা সেইখানে যেতে।

১। লাঠি।

ভবানী যে বলে এ ভবমণ্ডলে
ভবনে ভবানী তার।
ভবানীনন্দন ভারত ব্রাহ্মণ
ভবানী ভরসা যার॥

'হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি।
না জানে গৃহিণীপনা তোমার জননী॥
গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে।
সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে।)
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়।
ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়॥
অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়।
অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায়॥
শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী।
অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি॥
বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥
শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল॥
হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি।
দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি॥
হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি।
পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী॥
বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও।
শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও॥

এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর।
অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বসুন্ধরার জন্ম

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসোঁসর ॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল ॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন ॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া।
রাখিলেক কিছুদিন অচলা করিয়া ॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন ॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম ॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায় ॥

হেন কালে বসুন্ধরা অব্যাহতরূপে।
কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোককূপে॥
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামিহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥
আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥
শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি॥
পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।
অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে॥
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি॥
ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য।
হৌক মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য॥
এইরূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভৎর্সনে।
কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে॥
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়।
ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায়॥
ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে।
তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে॥
যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা।
বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা॥
আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত।
তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত॥

ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।
তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া॥
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ।
এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া।
সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈলা তারে॥
শুভ ক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগীব সোহাগ করিয়া॥
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল।
চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল॥
ঝড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে।
নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে॥
দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা।
কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল।
ভবানন্দ মজুন্দার যেমতে জন্মিল॥
কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে।
কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে।
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

কহেন ব্রাহ্মণ শুন হে সুজন
কেমন বুদ্ধি তোমার।
পণ্ডিত হইয়া পর্ব্ব না মানিয়া
করিছ রতিবিহার॥
এই যে অষ্টমী পুণ্যদা এ তমী[১]
অন্নদার ব্রততিথি।
ইহাতে অন্নদা অবশ্য বরদা
তাঁহারে কর অতিথি॥
এই দিব্য স্থল এ দ্রব্য সকল
অন্নদাপূজার যোগ্য।
না পূজি তাঁহারে যুবতীবিহারে
কেন কর প্রেতভোগ্য॥
এমন শুনিয়া হাসিয়া ঢুলিয়া
ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে।
মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া
জড়িমযুক্ত বচনে॥
অতিমত্ত মদে না গণে আপদে
কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা॥
এ সুখযামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক॥
জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।

১। রাত্রি।

অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥
শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী
আমি মর্ম্ম জানি তার ।
বাপার ভাণ্ডাবে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিন বার ॥
কি বলে বামণ অরে চরগণ
বধ রে ইহার প্রাণ ।
এমন শুনিয়া সক্রোধ হইয়া
দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
হুকাব ছাড়িয়া জয়ারে ডাকিয়া
বিজয়ারে দিলা পান ।
ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী
যুদ্ধে হৈল আগুয়ান ॥
ভাঙ্গি কুঞ্জবনে বধি যক্ষগণে
নলকূবরেবে ধরে ।
রমণী সঙ্গেতে বান্ধিয়া রঙ্গেতে
দিল অন্নদা গোচবে ॥
অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের লাগিযা
শাপ দিলা তিন জনে ।
মর্ত্ত্যলোকে যাও নরদেহ পাও
রায় গুণাকর ভণে ॥

দানবদমনী শমনশমনী
ভবানী ভবসংসারে গো।
সঙ্কটতারিণী লজ্জানিবারণী
তোমা বিনা কব কারে গো॥
জঠরযন্ত্রণা যমের মন্ত্রণা
কত সব বারে বারে গো।
দয়াদৃষ্টে চাহ ত্বরায় তরাহ
ভারতেরে ভবভারে গো॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে॥
ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম।
রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে।
এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে॥
তাহে রাম সমদ্দার নাম এক জন।
শ্রোত্রিয় কেশরী গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥
সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী।
ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি॥
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।
নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা॥
শুভ ক্ষণে নলকূবরের গর্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকূবর স্বচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভূপের আনন্দে॥

লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়।
বিস্তার বর্ণিতে তার পুথি বেড়ে যায়॥
চন্দ্রিণী পদ্মিনী দুহে কত দিন পরে।
জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দু জনার।
বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুমদার[১]॥
চন্দ্রমুখী প্রসবিলা তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে॥
পদ্মমুখী যুবতী রহিলা অই মত।
সুয়াভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত॥
নানা রসে মজুন্দার দুহে অভিলাষী।
সাধী মাধী নামে দুঁহে দিলা দুই দাসী॥
ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি।
আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী॥
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা।
দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা॥
এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে॥
ওই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥
স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে।
বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে॥

১। মজুন্দার—রাজস্বের হিসাব লেখক।

জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল।
অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল ॥
চারি দিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়।
দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায় ॥
সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে ॥
অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত।
রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত ॥

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা

কে জানিবে তারানামমহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো ॥
আগম নিগমে পুরাণ নিয়মে
শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধাম নাম
শিবের সেই সে অণিমা গো ॥
নিলে তারা নাম তরে পরিণাম
নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর কহে নিরন্তর
কি কর কৃপাময়ী মা গো ॥

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥

ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটুনীব বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তবে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥
সোনাব সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তীরে উত্তরিলা তরি তাবা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিল্যা আপনি॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোব হৈলা অষ্টাপদ[১]॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥

১। সোনা।

আকাশ বাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবত হৈলা ভবানন্দ মজুন্দার॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার॥
করুণাকটাক্ষ চয়[১] উত্তর উত্তর।
সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর॥
ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপআদিত্য মানসিংহের সমর॥

১। সমূহ।

সমাপ্ত